সমৃদ্ধ সংস্করণ



সাহাবীগণের হৃদয়ছোঁয়া আত্মদানের চিত্র

ইতিহাসের লাল সিন

শরীফ মুহাম্মদ



সাহাবীগণের হৃদয়ছোঁয়া আত্মদানের চিত্র

ইতিহাসের লাল আস্তিন

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সাহাবীগণের হৃদয়ছোঁয়া আত্মদানের চিত্র

ইতিহাসের লাল আস্তিন

মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আলকাউসার

বিভাগীয় সম্পাদক, দৈনিক আমার দেশ

মাকতাবাতুল আযহার

প্রথম আযহার সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৫
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

মাকতাবাতুল আযহারের পক্ষে ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা থেকে প্রকাশক
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ও দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী
টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং জননী প্রিন্টিং প্রেস ১৯
প্রতাপদাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত
ইমেইল : maktabatulazhar@yahoo.com

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
☎ : 02 988 15 32
✆ : 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী
টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ 017 15 02 31 18

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী. কালার ক্রিয়েশন
অলঙ্করণ : আবদুর রহমান
বর্ণবিন্যাস : মদীনা বর্ণশীলন, mdfaruque81@gmail.com

ISBN : 435-968-19890-9-1

মূল্য ১৪০ টাকা

ITIHASHER LAAL ASTIN By Sharif Muhammad
Published by Maktabatul Azhar. Dhaka, Bangladesh

MRP : Taka. 140 US $ 12

অর্পণ

অমর বাঙালী মুজাহিদ

গাজী ইমামুদ্দীন বাঙালী (রহ.)
সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রহ.)
আবদুল হাকীম চুনতী (রহ.)
মীর নেসার আলী তিতুমীর (রহ.)
হাজী শরীয়তুল্লাহ (রহ.)
কারামত আলী জৌনপুরী (রহ.)
গাজী আশেকুল্লাহ (রহ.)
কাজী মিয়াজান (রহ.)
জব্বর বখশ মিয়াঁ সাহেব (রহ.)-সহ

যুগে যুগে যারা ইসলামের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে
জীবন ও শ্রম দিয়ে পরপারে চলে গেছেন
তাঁদের রূহের মাগফিরাত ও দারাজাত বুলন্দির
উদ্দেশে।

লাল আস্তিনের ইতিহাস

নতুন সংস্করণে

সাহাবায়ে কেরামই হচ্ছেন এ উম্মাহর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মানবকাফেলা। ইসলামের জন্যে তাঁদের সাধনা, ত্যাগ ও আত্মদানের ইতিহাস ইতিহাসেরই এক প্রাচুর্যপূর্ণ সম্পদ। সব বিভা ও সৌন্দর্যের আধার তাঁদের জীবনের সবচেয়ে হৃদয়ছোঁয়া পর্বটি হলো আল্লাহর পথে তাদের অমলিন আত্মদান। শুনলে, পড়লে অনুভব হতে থাকে, এ যেন সমর্পণ ও নিবেদনের এক অনিশেষ সমুদ্র। আল্লাহর পথে আত্মদানের এ সমুদ্রের দিকে চোখ দিলে চোখের পাতা শুকনো রাখা কঠিন। গাফলত, আত্মবিস্মৃতি ও বিভ্রান্তির এ বর্তমানে হৃদয় ও চোখ ভেজানো তেমন কিছু ঘটনা নিয়ে এই 'ইতিহাসের লাল আস্তিন'। নির্ভরযোগ্য সাহাবাজীবন বিষয়ক আরবী-উর্দু-বাংলা কিছু গ্রন্থ থেকে তথ্যগত সহযোগিতা নিয়ে এ বইটি দাঁড় করানো হয়েছে।

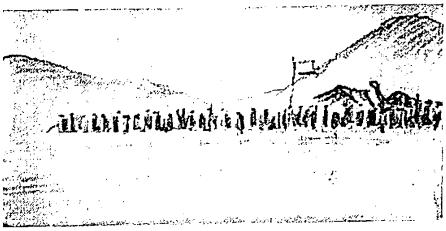
নয় বছর আগে প্রকাশিত বইটিকে নতুন করে সাজানো হলো এবার। সংযোজন হয়েছে নতুন আরেকটি ঘটনা; শহীদী অধ্যায়। এর সঙ্গে কিছু সম্পাদনা আর ঘটনাগুলোর তথ্যসূত্র যুক্ত করে দেয়া এ সংস্করণের বিশেষ কাজ।

বইটি পড়ে উম্মাহর যে কোনো সদস্যের হৃদয়ে বিস্মৃতি ও বিভ্রান্তির পরিবর্তে সুন্দর বোধের উদয় ঘটাই বড় সফলতা। ভুলকাজ ও বাড়াবাড়ির চড়াই-উৎরাইয়ের বাইরে আত্মদানের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়টির সমান্তরাল ও শান্তিপূর্ণ একটি 'আলোর ঝিলিক' এ বইটিতে পাওয়া যাবে বলে আশা করি। 'লাল আস্তিন' থেকে ইতিহাসের এক অমলিন দিগন্তের সন্ধান আমরা পেতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সে দিগন্তের সন্ধান দিন।

শরীফ মুহাম্মদ
২ জুলাই ২০১৫
পল্লবী, ঢাকা

সূচিপত্র

শহীদদের প্রধান / ১১
প্রথম শহীদ সেই নারী / ১৯
ঝাণ্ডা ঊর্ধ্বে রাখ! / ২৩
অঙ্গীকারের মূল্য! / ৩৪
খোঁড়া পায়ে তিনি জান্নাতে হাঁটছেন! / ৪১
ফোরাতের তীরে / ৪৬
এক্ষুণি লড়াই / ৫৪
বিপরীত আকাঙ্ক্ষার কথা / ৫৮
ধূলিধূসর লাল চেহারা তাঁর / ৬৩
হঠাৎ যুদ্ধ হঠাৎ শহীদ / ৬৯
নকীব যোদ্ধা শহীদ / ৭৩
পরোয়াহীন মৃত্যু পথযাত্রী / ৭৮
মৌমাছি পাহারা দিলো শহীদের লাশ / ৮৬
জানবায ইবনে খারাশা (রা.) / ৯১
ঘোড়সওয়ারের নামার সময় হয়নি! / ৯৬
স্মিত হাসির রেখা / ১০৬



শহীদদের প্রধান

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল এটি। প্রায় এক হাজার কাফের সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র তিনশ তেরজন মুসলিম সৈনিকের লড়াই। অভূতপূর্ব বিজয় সে যুদ্ধে মুসলমানরা লাভ করেন। উৎবা, শাইবা আবু জেহেলের মতো প্রভাবশালী কাফেরসর্দাররা সে যুদ্ধে নিহত হয়। শোচনীয় এ পরাজয় মক্কার কাফেরদের পক্ষে হজম করা কঠিন হয়ে যায়। আত্মাভিমান ও প্রতিশোধস্পৃহা বুকে নিয়ে বিশাল ও ব্যাপক প্রস্তুতিসহ তারা এক বছর পর আবারো মদীনায় হামলা চালাতে আসে।

তখন হিজরী তৃতীয় সন। শাওয়াল মাস চলছিলো। কাফেরদের মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতির খবর মদীনায় চলে আসে। মদীনায় শুরু হয় জিহাদের সাজ সাজ আয়োজন। অল্প সময়ের মধ্যে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে প্রায় হাজার খানেক মুসলিম সৈনিক মদীনা থেকে জিহাদের উদ্দেশে বের হয়ে যান। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয় উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে। শুরু হয় যুদ্ধ।

আরবের রীতি অনুযায়ী প্রথমেই কাফের শক্তির পক্ষ থেকে এগিয়ে আসে এক প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। 'সিবা' নাম তার। এগিয়ে এসেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানায়। তার আহ্বানে ঝরে পড়তে থাকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের উল্লাস। কিন্তু এ আহ্বানের জবাবে মুহূর্তকাল দেরি না করেই মুসলিম সৈনিকদের সারি থেকে বীরদর্পে এগিয়ে যান হযরত

হামযা (রা.)। খোলা তরবারি হাতে নিয়ে তিনি চারপাশ কাঁপানো এক হুঙ্কার ছেড়ে বলেন, উম্মে আনমারের অপবিত্র পানির সন্তান! তুই এসেছিস আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়তে? বড় দুঃসাহস তোর।' এ হুংকারের পরই শুরু করেন আক্রমণ।

আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের অবকাশই ছিল না। হযরত হামযার এক আঘাতেই সিবা ধরাশায়ী হয়ে যায়। এরপর দ্বন্দ্বযুদ্ধের শৃঙ্খলা আর থাকেনি, শুরু হয় সর্বাত্মক যুদ্ধ। চারদিকেই লড়াই, চারদিকেই খোলা তরবারির ঝনৎকার। আহত নিহতের আর্তনাদ, হাহাকার, চিৎকার। বীর হামযা (রা.) হৃদয় উজাড় করা জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর ক্ষিপ্র ও তীব্র আক্রমণে কাফেরদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায়। আশেপাশে বিক্ষিপ্ত হয়ে সরে পড়তে বাধ্য হয় তারা। এক হামযারই তীব্র ও জোরালো আক্রমণে ত্রিশজন কাফের সৈন্য নিহত হয় এ যুদ্ধে। এভাবেই তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পিঠ দেখানো নয়, লুকোচুরি নয়, প্রকাশ্য ও সামনা-সামনি আঘাতের এক দিগ্বিজয়ী জিহাদে তিনি নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করে দেন। জিহাদ এভাবেই চলতে থাকে।

হঠাৎ করেই একদম আড়াল থেকে এসে যায় আকস্মিক এক আঘাত। বর্ষার আঘাত ...

দুই

হামযা, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.)। নবীজী (সা.)-এর দু' বা চার বছরের বড়। নবীজীর আপন চাচা। অপরদিক থেকে তাঁর দুধ ভাই। আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবার দুধ শিশুবয়সে তাঁরা দু'জনই পান করেছিলেন। শৈশব-কৈশোর থেকেই নবীজীর সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। যৌবনে ও চল্লিশোত্তর বয়সে হামযা (রা.) দৈহিক দিক থেকে যেমন ছিলেন সুস্বাস্থ্য ও বীরত্বের অধিকারী তেমনি সুসাহস, অন্তরের সৌন্দর্য আর নিষ্কলুষতাতেও বিশেষ মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। ইসলামের সূচনালগ্নে যখন নিত্যদিন মুখের গালাগাল

ও শারীরিক অত্যাচারের শিকার হতেন মানবতার নবী এবং তাঁর সাহাবীগণ সে সময়েরই একটি পর্যায়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু জেহেল কর্তৃক সত্যপন্থী ভাতিজার নিগ্রহের কথা শুনে ক্ষিপ্র গতিতে কাবা ঘরের সামনে গিয়ে আবু জেহেলের মাথায় ধনুকের তীব্র এক আঘাত হানেন সেদিন। উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও চ্যালেঞ্জের সুরে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন তিনি।

সত্য কেবল গ্রহণই নয়, সত্যের উপর এক দৃঢ়চেতা উৎসর্গিত মানুষে পরিণত হন হামযা। সৎসাহস আর চ্যালেঞ্জিং মেজাজ ছিল তাঁর স্বভাবজাত। হযরত উমর (রা.) যেদিন ইসলাম গ্রহণের জন্য দারুল আরকামে যান আর তাঁর হাতে কোষমুক্ত তরবারি ঝুলতে থাকে সেদিন তাঁর মনোভাব আগে থেকে না জানার কারণে নবীজীর আশেপাশে উপস্থিত সাহাবীগণ কিছুটা শংকিত ও বিচলিত বোধ করেন। সেখানে হামযাও ছিলেন। হামযার গলার স্বর আর জোরই ছিল সেদিন অন্যরকম। তিনি বললেন, 'তাঁকে আসতে দাও। যদি সে ভালো উদ্দেশে এসে থাকে আমরাও তার সাথে ভালো ব্যবহার করবো। অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকলে তার তরবারি দিয়েই তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হবে।'

হিজরতের সময় তিনিও মদীনায় হিজরত করেন। হিজরতের প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে দুটি ছোট অভিযানে ঝাণ্ডা বহন ও নেতৃত্বদানের দায়িত্ব তিনি পালন করেন। এরপর আসে বদরের যুদ্ধ, ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ। এ জিহাদে আত্মোৎসর্গ ও একচ্ছত্র বীরত্বের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তিনি। যুদ্ধের শুরুতেই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মক্কার কাফের সর্দার- উৎবা তাঁর তরবারি আঘাতে নিহত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। মাথায় পাগড়ি বাধা হামযা দু'হাতে দুটি খোলা তরবারি নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কাফেরদের প্রতিরোধ আর রণসজ্জা তাঁর তরবারির আঘাতে গুঁড়িয়ে যায়। বহু কাফের তাঁর হাতে সে যুদ্ধে নিহত হয়। ইসলামের ঐতিহাসিক বিজয় সাধিত হয় সে জিহাদে।

পরাজিত মক্কার কাফেরদের অনেকেই বিশেষভাবে প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে ওঠে হামযা (রা.)-এর প্রতি। সামনের যে কোনো যুদ্ধে হামযাকে কীভাবে হত্যা করা যায় তার আয়োজন ও প্রস্তুতি শুরু হয় মক্কায়। বদরের জিহাদে হামযার তরবারির আঘাতে নিহত কাফের সরদার তুয়াইমা ইবনে আদীর ভাতিজা জুবায়ের ইবনে মুতইম এ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তার এক হাবশী ক্রীতদাস ছিল– ওয়াহশী। পরাজিত হয়ে ও প্রতিশোধচিন্তা মাথায় নিয়ে মক্কায় ফিরে আসার পর সে তার ক্রীতদাস ওয়াহশীকে প্রস্তাব দেয়, তুমি যদি হামযাকে হত্যা করে আমার চাচার হত্যার বদলা নিতে পারো তা হলে তোমাকে আযাদ করে দেবো। এরপর ওয়াহশীকে দেয়া হয় লক্ষ্যভেদ ও গুপ্ত-আঘাতের বিশেষ ট্রেনিং। ক্রীতদাস ওয়াহশীর ভেতরেও জেগে ওঠে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। উহুদের যুদ্ধে সব কাফের সৈনিকদের সঙ্গে ওয়াহশী কেবল ও উদ্দেশ্যেই অংশ নেয় যে, হামযাকে হত্যা করে সে মুক্ত হবে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই ওয়াহশী কেবল একটি ব্যক্তিকে হত্যার সুযোগের জন্য এককভাবে ওত পেতে থাকে, বড় একটি পাথরের আড়ালে।

তিন

জিহাদে উজাড় হয়ে যাওয়া বীর হামযা (রা.)-কে হঠাৎ ওয়াহশী পেয়ে গেলো তার খুব কাছাকাছি; লক্ষ্যের আওতার মধ্যে। পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে আসতেই টার্গেট ভেদ করা ওয়াহশীর একটি আঘাতেই হযরত হামযা (রা.) লুটিয়ে পড়লেন। হামযার বিশাল দেহটা বালির উপর পড়ে নিথর হয়ে রইল। মরুর বালি আর লাল রক্ত মিশে একাকার হয়ে গেলো। প্রাণবন্ত, উৎসর্গিত, বীর বাহাদুর হামযা শাহাদাতবরণ করলেন। সম্মুখ-সমরে নয়, অতর্কিত হামলায়। সত্যের এক সাহসী স্পন্দনই যেন থমকে গেলো। সাহস ও সত্যের দিগ্বিজয়ী এক ঘোড়াসওয়ার পার্থিব জগৎ থেকে বিদায় নিলেন। রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ও আস্থার মানুষ, অতি ঘনিষ্ঠ ও সহযোগী, উৎসর্গিত এক নিকটাত্মীয়ের জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি বন্ধ হয়ে গেলো।

অতর্কিত হামলায় হামযার জীবনের সমাপনই ঘটনার সমাপ্তি ছিল না। ইসলামের এতবড় এক বীর পুরুষের হত্যায় কাফের শিবিরে উল্লাসের বন্যা বয়ে যায়। আক্রোশে আক্রোশে তারা ঘটাতে থাকে বীভৎস সব কাণ্ড। হামযা (রা.)-এর আঘাতে বদরে নিহত কাফের নেতা– উৎবার কন্যা তৎকালীন কুরাইশনেতা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হামযার লাশের উপর চড়ে বসে। তাঁর নাক-কান কেটে অলংকার বানায়। তার চারপাশে অন্য নারীরা উল্লাসে নাচতে থাকে, গাইতে থাকে। হিন্দা এরপর অস্ত্র দিয়ে হামযার বুক ও পেট কেটে কলিজা বের করে চাবাতে থাকে। সত্যপন্থী, সাহসের কলিজাওয়ালা মহান এই শহীদের কলিজা হিন্দা চাবাতে থাকে আর থুথু ছিটাতে থাকে সে কলিজায়। আহা হামযা! জীবনটা দিয়েও কুফুরের বীভৎসতা থেকে রেহাই পেলেন না। কেবল আল্লাহর জন্য, আল্লাহর দ্বীনের জন্য, আল্লাহর রাসূলের জন্য তাঁর এই আত্মদান হয়েছিলো বলেই শাহাদাতের পর তাঁর লাশের উপর চলেছে বন্য ও আদিম এক বীভৎসতা।

চার

কাফেরদের উদ্যোগে সংঘটিত উহুদের যুদ্ধটা ছিলো এক অর্থে অমীমাংসিত এক যুদ্ধ। মুসলমানদের সামান্য ভুলের কারণে জয়-পরাজয়ের কোনো ফায়সালা এখানে হয়নি। উভয় পক্ষে বহু সৈনিক নিহত হয়। কিন্তু মুসলিম শিবিরে ছেয়ে যায় বেদনা ও হাহাকারের এক করুণ দৃশ্যচিত্র। যুদ্ধ যখন শেষ তখন কাফন-দাফনের পর্ব শুরু হলো শহীদগণের। যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত রাসূল (সা.) এলেন তাঁর প্রিয় চাচা, প্রিয়বন্ধু হামযার লাশের সামনে। তিনি দেখলেন সুন্দর দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী হামযার লাশটা নিথর হয়ে পড়ে আছে। তাঁর নাক-কান কাটা, তাঁর বুক-পেট ফাঁড়া, তাঁর কলিজা ক্ষত-বিক্ষত। আল্লাহর রাসূল (সা.) কেঁদে ফেললেন। তাঁর উজ্জ্বল কপোল বেয়ে সমানে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। এ দৃশ্য তিনি সইতে পারছিলেন না। স্বগতোক্তির মতো করে তিনি উপস্থিত সাহাবীদের বললেন,

"কিয়ামতের দিন হামযা হবে 'সাইয়েদুশ শুহাদা' সব শহীদের প্রধান। এরপর তিনি শহীদ হামযাকে খেতাব করে বললেন, তোমার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হোক। আমার জানা মতে তুমি ছিলে আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সচেতন, অত্যন্ত নেককার। যদি তোমার বোন সাফিয়ার শোকের কথা আমার মনে না থাকতো তাহলে এ ময়দানে তোমাকে এভাবেই ফেলে রেখে যেতাম। পশু-পাখি তোমাকে খেয়ে ফেলতো আর কিয়ামতের দিন তাদের পেট থেকে আল্লাহ তোমাকে জীবিত করতেন।'

হামযার শাহাদাতের দুঃসংবাদটি পেয়ে তার বোন, রাসূলের ফুফু সাফিয়া (রা.) ব্যাকুল হয়ে উহুদ প্রান্তরের দিকে ছুটে আসেন। দু'চোখের পানিতে তাঁর মুখ-বুক ভাসতে থাকে। কিন্তু রাসূল তাঁকে হামযার লাশ দেখতে না দিয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেন। কাফনের জন্য সাফিয়ার পাঠানো দুটি চাদর দিয়ে যখন হামযা (রা.)-এর কাফনের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল, তখন দেখা গেলো, আরেক শহীদের জন্য একটি কাপড় দরকার। শেষ পর্যন্ত এক কাপড়েই হামযাকে কাফন পরানো হলো। বিশাল দেহের অধিকারী হযরত হামযার জন্য কাপড়টি যথেষ্ট ছিল না। মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যায়, পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যায়। নবীজীর সিদ্ধান্তে মাথার দিকে কাপড় দিয়ে 'ইযখির' ঘাস দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো হামযার পা। এরপর তাঁকে দাফন করা হলো।

শহীদ হামযার তাজা দেহ উহুদের মাটির নিচে শুয়ে আছে আর তাঁর সুখী রূহ নিশ্চয়ই আল্লাহর দেয়া অফুরন্ত সুখ অর্জন করে চলেছে। রোজ-কিয়ামতে এই ক্ষত-বিক্ষত মহান বীর হাসিমুখ সব শহীদের আমীর বা সাইয়েদ হয়ে জেগে উঠবেন।

পাঁচ

উহুদের জিহাদ হয়েছিলো হিজরী তৃতীয় সনে। সে সময় থেকেই হামযার হত্যাকারী হাবশী ওয়াহশীর আযাদ বা স্বাধীন জীবন-যাপন

চলছিলো মক্কায়। এর পাঁচ বছর পর অষ্টম হিজরীতে যখন রাসূল (সা.) -এর নেতৃত্বে মক্কা বিজয় হয় এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দেয়া হয় তখন পেছনের সব গুনাহ-মাফের ঘোষণা শুনে এবং ঈমানের উত্তাপের আঁচ হৃদয়ে অনুভব করেই ওয়াহশী ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে দুরুদুরু বুকে ওয়াহশী (রা.) রাসূলের খেদমতে হাজির হন। নবীজী তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি ওয়াহশী?' ওয়াহশী বললেন, 'জ্বী।' এরপর কিছুটা কষ্ট আর ব্যাকুলতা নিয়ে মানুষ ও মানবতার নবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছো?' সত্যের পথে নবদীক্ষিত ওয়াহশী লজ্জা, অনুতাপ ও অন্তঃদহনে একদম মাটির সঙ্গে যেন মিশেই গেলেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল যা শুনেছেন তা সত্য।'

আল্লাহর রাসূল তো মানুষ ছিলেন। মানুষের মতো একটি মন ও মানব স্বভাবের বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর মাঝে থাকাই তো স্বাভাবিক। ওয়াহশীকে দেখেই বা দেখলেই তাঁর মনে হামযার সেই বুকফাঁড়া, ক্ষতবিক্ষত লাশের কথা মনে হয়ে যেতো, কষ্টে কষ্টে বুকটা ছারখার হয়ে যেতো। দুঃসহ বেদনার এই হঠাৎ ছাপে তো তাঁর মনে ওয়াহশীর প্রতিও কোনো বাড়তি কষ্ট এসে যেতে পারে, এতে তো ওয়াহশীরও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। অথচ ওয়াহশী এখন কালেমা-গো মুসলিম। তার ক্ষেত্রে এমন তো না হওয়াই দরকার। তাই তিনি যেন কিছুটা অনুরোধের সুরেই ওয়াহ্শীকে বললেন, 'তুমি কি তোমার চেহারাটা আমার কাছ থেকে একটু আড়াল করে রাখতে পারো?'

রাসূলের এই কথা শুনে ওয়াহশী (রা.) দেরি করলেন না। মুহূর্তের মধ্যেই উঠে পড়লেন। নিষ্ঠাবান মুজাহিদ এই সাহাবী রাসূলের জীবদ্দশায় আর কখনো রাসূলের সামনাসামনি হননি। সামনে যাননি, যেতে পারেননি। অন্য এক কষ্ট ও অন্তঃদহনে তাঁর দিন কেটেছে। রাসূলের দরবারে গেলেও সামনাসামনি না বসে আড়ালে বা পেছনের দিকে বসতেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) -এর খেলাফতের যুগে

ভণ্ডনবী মুসায়লামার বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে তিনি বিরাট ভূমিকা রাখেন এবং মুসায়লামাকে তিনিই হত্যা করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ ঘটনাটিকে হযরত ওয়াহশীর জন্য 'হামযা হত্যার কাফফারা'রূপে অভিহিত করা হয়। ⊙

[তথ্যসূত্র : সহীহ বুখারী– ৪০৭২;
আল ইসাবা, নং– ১৮৩১;
আল ইসাবা, নং– ৯১২৯]



প্রথম শহীদ সেই নারী

ইসলামের একদম সূচনাকালটি ছিল কাফেরদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করার এক কষ্টবহ দুঃসহ কাল। যারাই ইসলাম গ্রহণ করতেন সমাজ ও গোত্রের নেতাদের নির্যাতন-নিগ্রহের ভয়ে তারা তা প্রকাশ করতেন না। সত্যের দীক্ষা গ্রহণ করতেন গোপনে, সত্য শিখতেন গোপনে এবং গোপনেই তার প্রচার করতেন জীবন-মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে।

এর মধ্যেও যারা ছিলেন সামাজিকভাবে শক্ত শেকড়বিহীন, শক্তি ও প্রভাব যাদের ছিল না, যারা ছিলেন কারো গোলাম, ক্রীতদাস বা আশ্রিত পর্যায়ের, তাদের অবস্থা হতো আর শোচনীয়। কোনোভাবে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ হয়ে গেলেই তাদের কাউকে গরম বালিতে পাথর চাপা দিয়ে, কাউকে লোহার বর্ম পরিয়ে রেখে, কাউকে বালিতে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে অত্যাচার করা হতো।

এসব অত্যাচার যে কত তীব্র আর হৃদয়বিদারক হতো, হযরত বিলাল (রা.), হযরত খাব্বাস (রা.)-এর মতো সাহাবীগণের নিপীড়িত জীবন ছিল তার বেদনামাখা উদাহরণ। এ অত্যাচার কি কেবলই অত্যাচারের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল? আল্লাহর পথে এভাবে কি কোনো একজন সাহাবীর জীবনেও চূড়ান্ত বিসর্জনের ঘটনা ঘটেনি? আসুন, দেখি, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাই।

দুই

পরিবারের এক যুবক সন্তান আম্মার (রা.)। প্রথমে এ পরিবারের পক্ষ থেকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর মা-বাবা; হযরত সুমাইয়া (রা.) এবং হযরত ইয়াসির (রা.)। ইসলাম গ্রহণ করেন এঁদেরই আরেক সন্তান আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসির (রা.)। এঁরা ছিলেন ইসলাম গ্রহণের ঘোষণাদানকারী প্রথম সাত থেকে দশজনের অন্তর্ভুক্ত। এ পরিবারের প্রধান ইয়াসির মক্কায় আসেন ইয়ামেন থেকে। এখানে এসে তিনি হুযাইফা ইবনে মুগীরার দাসী সুমাইয়াকে বিয়ে করেন। হুযাইফা ইবনে মুগীরার সাথে বিশেষ মৈত্রীচুক্তির সূত্র ধরে তাঁদের এ বিবাহ সম্পন্ন হয়। মক্কায় তাঁদের নিজেদের কোনো গোত্র ছিল না। মক্কায় তাঁদের জীবন ছিল নিরীহ ও গোত্রহীন একটি পরিবারের জীবন। এ কারণেই ইসলাম গ্রহণকারী এ পরিবারটির ওপর নেমে আসে ভয়াবহ নির্যাতন। এ নির্যাতনে একজন ছাড়া প্রায় গোটা পরিবারটিই তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাদেরকে উদ্ধার করার মতো, রক্ষা করার মতো কোনো ব্যক্তি বা শক্তি তখন ছিল না। ছিল না সে রকম কোনো পরিবেশও।

সে জন্য প্রায় দিনই কাফের গোত্রপতিরা তাদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যেত। উন্মুক্ত প্রান্তরে লোহার বেড়ি পরিয়ে, রোদে উত্তপ্ত মরুর বালিতে শুইয়ে রেখে, পাথর চাপা দিয়ে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হতো। এরকম অত্যাচার চলতো কোনো কোনো সময় প্রায় সারাটা দিন জুড়ে। 'আলবাতহা' উপত্যকার পথ ধরে একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেঁটে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর কোনো কোনো সাহাবী। তাঁরা দেখতে পেলেন প্রখর রোদের মধ্যে আম্মার, তাঁর মা-বাবা এবং ভাইয়ের উপর চালানো হচ্ছে বিভিন্ন রকম অত্যাচার। এ বুকফাঁটা দৃশ্য দেখে নবীজীর শরীর ও মন বিষন্ন হয়ে গেলো। তাঁর ওপরও তো তখন চারদিকের চাপ। হাত-পা বাঁধা

অবস্থার মতো। তিনি ইচ্ছা করলেই কাফের-মুশরিকদের জোটবদ্ধ এই পশুত্বের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবেন না। তিনি দাঁড়িয়ে দেখলেন এই করুণ দৃশ্য। আর তাঁকে দেখতে পেয়েই সে পরিবারের প্রধান হযরত ইয়াসির (রা.) হাহাকারের সুরে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! কালের চক্র এ রকম হয়ে গেল?' বুকের ভেতরে কষ্টের পাথর চাপা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) মমতাভরাট কণ্ঠে তাঁদের বললেন, 'হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর। তোমাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।' নবীজী আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ পেশ করলেন, 'হে আল্লাহ! ইয়াসির পরিবারকে ক্ষমা করুন।'

এ ছিল একদিনের দৃশ্য। এ দৃশ্যটি প্রায় দিনই 'বাতহা' উপত্যকাসহ বিভিন্ন মরুভূমি আর আঙ্গিনায় দেখা যেত। এ ধরনের অত্যাচার-উৎপীড়নের মধ্যেই হযরত ইয়াসিরের মৃত্যু হয়। মৃত্যু হয় আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসিরেরও। তীর বিদ্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়। এভাবেই এ পরিবারের সদস্যরা ইসলামের একদম প্রথম যুগে নিজেদের উৎসর্গ করে দেন, উজাড় করে দেন। শাহাদাতের স্বর্ণালি পথ ধরে তাঁরা ইতিহাস আলোকিত করে যান। কিন্তু এর আগে ঘটে যায় অন্য একটি ঘটনা। সেটিও এ পরিবারেরই। সেটি আরও বেদনাবহ, সেটি আরও মর্মস্পর্শী। আল্লাহর পথে আত্মদানের ঘটনা এই উম্মতের ইতিহাসে সেটিই প্রথম।

তিন

একদিনের ঘটনা। ইয়াসির পরিবারকে দিনভর অত্যাচার করা হলো। কেন তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে– এ অপরাধে তাদের নানাভাবে নিগ্রহের শিকার বানানো হলো। ইয়াসিরের স্ত্রী, আম্মারের আম্মা হযরত সুমাইয়া ছিলেন বয়সে প্রৌঢ়া এক মহিলা সাহাবী। অত্যাচার-নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে শারীরিকভাবে ভেঙ্গে পড়লেও মনের মাঝে

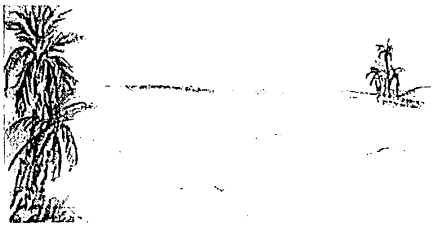
কোনো দুর্বলতা তিনি ঢুকতে দেননি। ঈমান ও দ্বীনের ব্যাপারে তাঁর অন্তর ছিল তরতাজা এক বাহাদুরের দিলের মতোই। সন্ধ্যায় যখন তিনি বাড়ি ফিরে এলেন তখনও তাঁকে ছাড়লো না কাফের সর্দাররা। আশ্রাব্য গালাগাল দিতে লাগলো তাঁকে। কাজটি করলো পশুত্বের মূর্তিমান রূপ আবু জেহেল। সে পশুদের পাশবিকতাকেও হার মানালো এরপর। হযরত সুমাইয়ার তলপেট লক্ষ করে নিক্ষেপ করলো ধারালো বর্ষা। সে বর্ষা গিয়ে বিঁধলো তার গোপনাঙ্গে। রক্তের বন্যা বয়ে যেতে থাকলো। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে আল্লাহর পথে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

ইসলামের প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া (রা.)। এর কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর স্বামী ও এক সন্তান নির্যাতনে নির্যাতনে শহীদ হন। এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকেন কেবল মা-হারা, বাবা-হারা এক আম্মার (রা.)। ইসলামের জন্য এই যুবক আমৃত্যু সেবা ও শ্রম দিয়ে গেছেন।

চার

হিজরতের দ্বিতীয় সনে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধে নিহত হয় পশুত্বের জীবন্ত উদাহরণ পাষণ্ড আবু জেহেল। মুসলিম শিবিরের জন্য এ মৃত্যু ছিল এক বিরাট বিজয় ও আনন্দের বিষয়। রাসূল (সা.) আবু জেহেল নিহত হওয়ার পর ইসলামের জন্য সবহারা যুবক হযরত আম্মার (রা.)-কে বললেন, 'আম্মার! আল্লাহ তোমার মায়ের ঘাতককে হত্যা করেছেন।' ⊙

[তথ্যসূত্র : আল ইসাবা– নং, ১১৩৩৩]



ঝাণ্ডা উর্ধ্বে রাখো!

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ডাকে দ্বীনের পথে জীবন-প্রাণ বিলিয়ে দেয়াই সাহাবীগণের জীবনের বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি আচরণ এবং প্রতিটি জিহাদে হযরত সাহাবায়ে কেরামের নিবেদন ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এ সত্যই ফুটে উঠেছিল। কিন্তু কোনো কোনো জিহাদে এ ত্যাগের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছিল আরো কিছু স্বর্ণালি বৈশিষ্ট্য, আরো কিছু উজ্জ্বল আদর্শ ও পাঠ। মূতার জিহাদে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিন প্রিয় সাহাবীকে তিনি পর্যায়ক্রমে সেনাপতির দায়িত্ব দেন। প্রথমে একজনকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে শাহাদাতের সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে আরো দু'জনের নাম ঘোষণা করেন।

সেনাপতির হাতে তুলে দেন ইসলামের ঝাণ্ডা। অসম এক লড়াইয়ে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। জীবনের মায়া তো বহু দূরের প্রশ্ন, জীবনী শক্তির শেষবিন্দু পর্যন্ত ইসলামের ঝাণ্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরার এক কিংবদন্তি তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করে যান। পৃথিবীর ইতিহাসের পথ ধরে বহু পানি এবং বহু মুসাফির এর পরও গুজরে গেছেন। কিন্তু উৎসর্গিত প্রাণের বিনিময়ে সত্যের ঝাণ্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরার এমন নজির খুঁজে অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি।

এ ছিল এক রুদ্ধশ্বাস দাস্তান। এ ছিল এক অবিশ্বাস্য জীবনদান। এ ছিল এক ঈমানদীপ্ত মর্যাদাবোধ। এর কোনো তুলনা দুনিয়ার অন্য কোথাও খুঁজে ফেরাও নিশ্চয়ই নিস্ফল চেষ্টার নামান্তর।

দুই

হিজরী অষ্টম সনের ঘটনা।

দুনিয়ার দেশে দেশে ইসলামের প্রতি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে পত্র পাঠানোর অংশ হিসেবে বসরার শাসকের কাছেও একটি পত্র দিয়ে একজন দূত পাঠানো হয়। শান্তির নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূত হিসেবে যাকে পাঠান তিনি ছিলেন হারিস ইবনে উমাইর আল আযদী (রা.)। হারিস যখন জর্দানের পূর্ব সীমান্ত 'মূতা' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন তখন সেখানে প্রথমে তাকে বন্দি করা হয়। এরপর করা হয় হত্যা।

যে কোনো প্রস্তাব, আহ্বান ও চুক্তির বিষয়ে শত্রু-মিত্র সবার কাছেই দূত পাঠানোর বিষয়টি তৎকালীন আরবে ছিল স্বীকৃত ও নিরাপদ একটি বিষয়। দূতের নিরাপত্তার বিষয়ে কেউ কোনো দুশ্চিন্তায় ভুগতেন না। সেজন্যই এ ঘটনাটিকে কিছুতেই সাধারণ একটি হত্যাকাণ্ড বা দুর্ঘটনা হিসেবে মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। প্রচলিত সৌজন্য, শিষ্টাচার ও নীতির ওপর কুঠারাঘাত, মানবতা বিনাশী এবং স্পষ্টতই যুদ্ধের ঘোষণা হিসেবেই এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটিকে গণ্য করেন প্রিয় নবী (সা.)। যুদ্ধের জন্য তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী গঠন করা হয় অনতিবিলম্বে। প্রস্তুতি চলে মূতা অভিযানের।

অভিযানের শুরুতেই পর্যায়ক্রমে তিন সেনাপতির নাম ঘোষণা করেন নবীজী। তিনি বলেন, এ বাহিনীর প্রধান হবে যায়েদ ইবনে হারিসা। যায়েদ যদি শহীদ হয়ে যায় তাহলে প্রধান হবে জাফর ইবনে আবি তালিব। জাফর শহীদ হলে প্রধান হবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। আর সে যদি শহীদ হয়ে যায় তাহলে মুসলমানরা পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের আমীর বানিয়ে নেবে।'

তিন

কে এই তিন সেনাপতি?

কঠিন দায়িত্বপূর্ণ এক জিহাদে সেনাপতির দায়িত্ব যাঁদের কাঁধে পর্যায়ক্রমে তুলে দেয়ার ঘোষণা দিলেন নবীজী- তারা কারা?

যায়েদ, যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.)। লুট হয়ে যাওয়া কাফেলার আট বছর বয়সী যায়েদকে উকাযের বাজার থেকে ক্রীতদাস হিসেবে খরিদ করে এনেছিলেন হযরত খাদীজা (রা.) -এর ভাতিজা হাকীম ইবনে হিযাম। ফুফুর কাজকর্মে সাহায্যের জন্য তাঁকে উপহার হিসেবে দান করেন এই ক্রীতদাস বালকটিকে। খাদীজার সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর এই বালকটি স্ত্রীর পক্ষ থেকে উপহার হয়ে আসে প্রিয় নবীর হাতে। তখনও তিনি নবুওয়ত পাননি। তখন তিনি বিশ্বস্ত যুবক মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। এরপর সন্তানের সন্ধান পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে পাগলপারা হয়ে যায়েদের পিতা হারিসা ও তার চাচা কা'ব বিপুল পরিমাণ মুক্তিপণ নিয়ে মক্কায় উপস্থিত হয়ে যুবক মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে তাদের সন্তানকে মুক্তি দেয়ার আবেদন রাখলে নবীজী মুক্তিপণ ছাড়াই নিঃশর্তভাবে মুক্ত হওয়ার এক্তিয়ার যায়েদের হাতে সঁপে দেন। পিতা ও চাচার সামনে দাঁড়িয়ে বালক যায়েদ সেদিন স্পষ্ট স্বরে নবীজীকে বলেন, আমি আপনার সঙ্গেই থাকবো।' হতবাক যায়েদের পিতা ও চাচার সামনেই পবিত্র কা'বার কাছে দাঁড়িয়ে নবীজী ঘোষণা করেন, 'আজ থেকে যায়েদ আমার ছেলে। সে হবে আমার এবং আমি হবো তার উত্তরাধিকারী।'

এরপরের ইতিহাস কেবল নবীজীর সঙ্গে যায়েদের স্নেহ-শ্রদ্ধা ও হৃদ্যতার এক দীর্ঘ উষ্ণতার অধ্যায়। জীবনের প্রতিটি পর্বেই যায়েদ নবীজীর জন্য তার সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছেন। নবী তাঁকে ভালোবেসেছেন হৃদয়ের টুকরার মতো। এভাবে তাঁর নামই হয়ে যায় 'হিব্বু রাসূলিল্লাহ'– রাসূলের একান্ত প্রিয়জন। প্রখ্যাত সমরনায়ক

সাহাবী হযরত উসামা তাঁরই সন্তান– উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)। মূতার অভিযানে যায়েদই হন প্রথম সেনাপতি।

জাফর, জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.)। নবীজীর অভিভাবক চাচা আবু তালিবের ছেলে। হযরত আলী (রা.)-এর সহোদর। বয়সে তাঁর চেয়ে বছর দশেকের বড়। আকার আকৃতিতে হযরত রাসূলে কারীম (সা.)-এর প্রায় পূর্ণ সদৃশ। ইসলামের সূচনালগ্নেই তিনি ও তাঁর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার অত্যাচারী কাফের-মুশরেক কুরাইশদের অত্যাচারে নবীজীর অনুমোদন সাপেক্ষে হাবশায় প্রথম হিজরতের নেতৃত্ব দেন এই জাফর।

হাবশায় বাদশা নাজ্জাশীর আশ্রয়ে তাঁরা নিরাপদে ইসলামের উপর অবিচল থেকে জীবন যাপন করছিলেন। এরপর যখন তাদের ব্যাপারে নাজ্জাশীকে বিক্ষুব্ধ ও বিরক্ত করে তুলে তাদের আবার ফেরত নেয়া কিংবা হাবশাতেই তাদের জীবন বিপর্যস্ত করে তোলার জন্য কুরাইশদের পক্ষ থেকে দূত পাঠানো হয় এবং নাজ্জাশীর কান ভারী করে তোলা হয় তখন দু' দু'বার এই জাফরই ইসলামের স্বরূপ ও বিধিবিধানের সৌন্দর্য বাদশা নাজ্জাশীর সামনে তুলে ধরেন। এক পর্যায়ে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের সূরায়ে মরিয়ম থেকে তেলাওয়াত করতে থাকেন জাফর। নাজ্জাশী ও তার সভাসদগণ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন তাঁর তেলাওয়াত শুনে। ব্যর্থ হয়ে যায় হাবশায় হিজরতকারীদের ব্যাপারে কুরাইশদের ষড়যন্ত্র। নাজ্জাশী তাঁদের নিশ্চিন্তে নিরাপদে ধর্মকর্ম করার ব্যবস্থা করে দেন। সপ্তম হিজরীতে হাবশায় হিজরতকারী মুসলমানদের একটি দল নিয়ে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। সেদিনটি ছিল খাইবার বিজয় শেষে মুসলমানদের মদীনায় ফিরে আসার দিন। জাফরকে দেখে নবীজী খুশিতে অভিভূত হয়ে তাঁর কপালে চুমু খান।

জাফর ছিলেন দরিদ্র, গরিব, মিসকীনদের প্রতি বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল এক অন্য মানুষ। বহু নিঃস্ব, গরিব ও মেহমানকে তিনি

না খেয়েও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তাঁকে ডাকা হতো 'আবুল মাসাকীন' বা মিসকীনদের পিতা বলে। মূতা অভিযানে সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে তাঁকে দ্বিতীয় পর্যায়ে সেনাপতি ঘোষণা করেন নবীজী (সা.)।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)। মদীনার খাযরাজ গোত্রের হারিস শাখার সন্তান। মদীনাবাসীদের মাঝে প্রথম দিককার ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। বদরসহ অধিকাংশ জিহাদে বীরত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো অভিযানে তাঁর হাতে নেতৃত্ব তুলে দেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি 'রাসূলের কবি' নামে খ্যাত ছিলেন। স্বভাবকবি হিসেবে মুহূর্তের মধ্যেই ইসলামের শাশ্বত রূপ আর শত্রুপক্ষের অসারতা সম্পর্কে কাব্য রচনায় তাঁর জুড়ি ছিল না। খন্দকের যুদ্ধে তাঁর রচিত একটি কবিতা রাসূলুল্লাহ (সা.) আবৃত্তি করেছেন বার বার। আনসার এই সাহাবী ছিলেন দুনিয়াবিবাগী, অধিক যিকিরকারী, অনন্য আবেদ ব্যক্তি। ঈমানকে তাজা করার জন্য তিনি অন্যদেরও যিকিরে নিমগ্ন হওয়ার আহ্বান জানাতেন। যিকিরের মজলিসকে তিনি বলতেন ঈমানের মজলিস। রাসূল (সা.)-কে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। রাসূলও তাকে খুব ভালোবাসতেন। রাসূলের আদেশ-নিষেধ পুরাপুরি পালন করতেন। সুযোগ থাকলেও আদেশ পালন না করার জন্য কোনো ব্যাখ্যা খুঁজতে চাইতেন না। তাঁর জীবনের উজ্জ্বল নানা বৈশিষ্ট্যের কারণে নবীজী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন– 'কতই না ভালো মানুষ ছিল আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা!'

চার

টানটান উত্তেজনা, টগবগে আবেগ আর সমর্পণের এক সুন্দর প্রস্তুতি শুরু হয় অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে। তিন হাজার সৈন্যের এ বাহিনী যাত্রা শুরু করে মূতার উদ্দেশে। সে দিনটি ছিল শুক্রবার।

মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার সময় এ বাহিনীকে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিদায় জানান হযরত রাসূলে করীম (সা.)। হযরত যায়েদের নেতৃত্বে এ বাহিনী এগিয়ে যেতে থাকে। জর্দানের পূর্ব সীমান্তে 'মাআন' নামক স্থানে পৌঁছে তাঁরা জানতে পারেন রোম সম্রাট হিরাকলের পক্ষ থেকে এক লাখ সৈনিকের এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত হয়ে আছে। তাদের পেছনে রয়েছে পৌত্তলিক আরবদের বিভিন্ন গোত্রের আরো লাখ খানেক সৈন্য। এ অবস্থায় মুসলিম বাহিনী 'মাআনে' দু'রাত অবস্থান নিলেন এবং অপর দিকের বিশাল যুদ্ধ প্রস্তুতির মোকাবেলায় তাদের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শে বসলেন। শত্রুপক্ষের বিশাল রণপ্রস্তুতির বিজয়টি রাসূলকে জানিয়ে পরবর্তী করণীয় ঠিক করা কিংবা অন্য কোনো কৌশল গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনার পর সাব্যস্ত হয়, শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা যতই বেশি থাকুক, জিহাদে নেমে যাওয়াই হচ্ছে সমাধান।

এরপর শুরু হয় আবারো যুদ্ধ যাত্রা। তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী এসে দাঁড়ান প্রায় দু'লাখ শত্রুসেনার মুখোমুখি, মূতায়। এরপর যুদ্ধ। অসম এক যুদ্ধ। কিন্তু আল্লাহনির্ভরতা ও দৃঢ়তার আকাশ-সমান উচ্চতার দাস্তান তৈরি হয় সে যুদ্ধে। সমর্পণ ও বীরত্বের, উৎসর্গ ও নির্ভরতার এক সম্মিলিত সুর সেখানে উচ্চারিত হয়ে উঠে। আত্মত্যাগী, উৎসর্গিতপ্রাণ ক'জন সাহাবীর শাহাদাতের সিঁড়ি বেয়ে এখানে বিজয়ের সূর্য উঠে। মুজাহিদ সাহাবীগণ মদীনায় ফিরে আসেন বিজয়ী বেশে। পেছনে রেখে আসেন শাহাদাতের লাল আস্তিন। রেখে আসেন ইসলামের পতাকা আকাশে তুলে রাখার এক জীবনদেয়া প্রত্যয়ের দৃশ্য।

পাঁচ

সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) যুদ্ধের শুরু থেকেই গোটা বাহিনী পরিচালনা কেবল নয়, নিজেও পুরো দস্তুর ঝাঁপিয়ে পড়েন ময়দানে।

অসীম সাহসে শত্রুসেনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এক হাতে তরবারি চালাতে থাকেন আরেক হাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর পক্ষ থেকে দেয়া ঝাণ্ডা বহন করেন। তীর ও বর্ষার অগণিত আঘাতে তাঁর দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। রক্তের এক লাল স্রোত নিয়েই তিনি ছুটতে থাকেন রণাঙ্গনে। এভাবেই কিছুক্ষণের মধ্যেই রাসূলঅন্তপ্রাণ, হিব্বু রাসূলিল্লাহ ইসলামের জন্য, রাসূলের জন্য পিতা-মাতা গোত্র ছেড়ে দেয়া যায়েদ মূতার ময়দানে লুটিয়ে পড়েন।

মুহূর্তের জন্যও তিনি থমকে যাননি। আঘাতে আঘাতে তাঁর জীবন চলে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে জেনেও জীবনী শক্তি থাকার শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত ইসলামের পতাকাকে নিচে নামতে দেননি।

প্রথম সেনাপতির শাহাদাতের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের সেনাপতির দায়িত্ব হযরত জাফরের কাঁধে চলে আসে। নিজের ঘোড়া থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়েন তিনি। শূন্য ঘোড়াটি যেন শত্রুপক্ষীয় কেউ ব্যবহার না করতে পারে সেজন্য নিজ তরবারির আঘাতে ঘোড়াটিকে হত্যা করেন। শহীদ যায়েদের হাত থেকে ঝাণ্ডাটি নিজের হাতে তুলে নেন। মুহূর্তের মধ্যেই তরবারি চালাতে চালাতে রোমান বাহিনীর আরো অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন তিনি। শত্রুর আঘাতে তার ডান হাতটি যখন দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় তখন বাঁ হাতে পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। এর কিছুক্ষণ পর শত্রুদের আরেকটি তরবারির আঘাত তার বাঁ হাতটিকেও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। দু'হাতই তাঁর কেটে যায়। বাহু দিয়ে বুকের সঙ্গে পতাকার লাঠি জাপটে ধরে রাখেন। এই অনমনীয় বীরত্বের, এই অতুলনীয় ইসলামপ্রেমের মধ্যেই শত্রুদের আরেকটি আঘাতে তাঁর দেহটিই দু'টুকরো হয়ে যায়। রক্তের সাগরে ভাসতে থাকেন রাসূলের প্রিয় চাচাতো ভাই হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.)। যুদ্ধ শেষে জাফরের লাশ তালাশ করে দেখা গেলো, শুধু তার সামনের দিকেই পঞ্চাশটি আঘাতের চিহ্ন। সারা দেহে তাঁর নব্বইটিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন ছিল। কিন্তু তাঁর দেহের পেছন দিকে একটি চিহ্নও ছিল না।

জীবন ও শক্তির শেষ বিন্দুটুকু দিয়ে ইসলামের বিজয় এবং ইসলামী ঝাণ্ডার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে শাহাদাতের পূর্বক্ষণেও নজিরবিহীন এক উপমা দাঁড় করিয়ে যান তিনি।

পর্যায়ক্রমে তৃতীয় সেনাপতি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এবার হয়ে যান সেনাপতি। এটিই রাসূলের সিদ্ধান্ত। জাফরের শাহাদাতের দৃশ্যটি তাঁর চোখের সামনে। তিনিও নিজের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামেন। পতাকাটি হাতে উঠিয়ে নেন। মুহূর্তের মধ্যে আগত দ্বিধার একটি ভাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বীর বিক্রমে ময়দানে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। প্রচণ্ড ক্ষুধা-কাতরতার মধ্যে তাঁর এক চাচাতো ভাইয়ের দেয়া একটি হাড়ের টুকরার সামান্য অংশ মুখে লাগানো মাত্রই রণাঙ্গনে প্রচণ্ড শোরগোল উঠে। 'তুমি এখনও বেঁচে আছো?' নিজের প্রতি ভর্ৎসনামূলক এই ধ্বনি উচ্চারণ করে তিনি তরবারি চালাতে থাকেন। এসময় শত্রুসৈন্যের একটি তীর এসে তাঁর দেহে বিদ্ধ হয়। রক্তে গোটা দেহ তাঁর লাল হয়ে যায়। সে অবস্থাতেই তিনি হাঁক দেন। মুসলিম যোদ্ধাদের একটি দল তাঁকে ঘিরে রাখে, আরেকটি দল প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন রাসূলের কবি, রাসূলপ্রেমিক, আবেদ-যাহেদ-যাকের সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। এরপর ঝাণ্ডা হাতে নেন হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.); উপস্থিত মুসলিম সৈনিকদের পরামর্শে।

ছয়

মূতার যুদ্ধে তিন সেনাপতির শাহাদাতের খবর আনুষ্ঠানিকভাবে মদীনায় আসার আগেই হযরত রাসূলে করীম (সা.) ওহীর মাধ্যমে বেদনাদায়ক খবরটি পেয়ে যান। তিনি একে একে তিনি সেনাপতির শাহাদাতের খবর উপস্থিত সাহাবীদের জানাচ্ছিলেন আর তাঁর দু'চোখ বেয়ে শোকের অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। মূতার অভিযানের বেদনাদায়ক

সংবাদটি নবীজীর কাছে পৌঁছার পর তিনি এতোটাই বিমর্ষ হয়ে পড়েন যে, এর পূর্বে আর কখনো তাঁকে এতোটা বিমর্ষ দেখা যায়নি। অনতিদেরিতে একে একে সব শহীদ সেনাপতির বাড়িতে সমবেদনা জানাতে তিনি উপস্থিত হন। তিনি নিজে ছিলেন শোকাভিভূত। শহীদ সাহাবীদের শিশু সন্তানদের কান্নার সামনে তিনি আরো দুঃখ-বেদনার মাঝে ডুবে যান। শাহাদাতের লাল অধ্যায়ের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায় পবিত্র চোখের পানির স্রোত।

নবীজী (সা.) যখন হযরত যায়েদের বাড়িতে পৌঁছান এবং খবরটি জানান তখন যায়েদের ছোট্ট মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে এসে নবীজীকে জড়িয়ে ধরেন। নবীজী (সা.) নিজেও উচ্চস্বরে কেঁদে উঠেন। উপস্থিত হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রা.) নবীজীর শোক-বিহ্বলতা দেখে ও কান্নাধ্বনি শুনে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কী?

প্রশান্ত ও শোকাভিভূত কণ্ঠে নবীজী (সা.) উত্তর দেন, 'এ হচ্ছে মমতা ও ভালোবাসার প্রকাশ।'

নবীজী (সা.) যখন শহীদ জাফরের বাড়িতে যান তখন তাঁর স্ত্রী যুদ্ধফেরত স্বামীকে অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হযরত জাফরের পরিবারের কাছে তখনও দুঃসংবাদটি পৌঁছায়নি। ফাজরের স্ত্রী রুটি বানানোর জন্য আটার খামিরা করে রেখেছেন। ছেলে-মেয়েদের গোসল করিয়ে গায়ে তেল লাগিয়ে নতুন পোশাক পরিয়েছেন। পাতলা ও পরিষ্কার একটি কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নবীজী যখন জাফরের বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন দূর থেকে তাঁকে দেখেই জাফরের স্ত্রীর মনে অজানা আশংকা জেগে উঠেছিল। নিজ থেকে জাফরের স্ত্রী নবীজীকে হযরত জাফর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে একদম সাহস পাচ্ছিলেন না।

পারিবারিক খোঁজ খবর নিয়ে নবীজী এরপর বললেন : 'জাফরের ছেলে-মেয়েদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' জাফরের স্ত্রী বাচ্চাদের ডাকলেন। বাচ্চারা খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে একে অপরের সঙ্গে

প্রতিযোগিতা করতে করতে রাসূলের দিকে এগিয়ে গেলো। মমতার সাগর প্রিয় নবী শহীদ জাফরের বাচ্চাদের জড়িয়ে ধরে চুমু দিতে লাগলেন। আর তাঁর দু'চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। এ দৃশ্য দেখে ব্যাকুল হয়ে জাফরজায়া আসমা যখন সব খবর জানতে চাইলেন, তখন মমতা ও শোকের অতল গহ্বর থেকে প্রিয় নবী উচ্চারণ করলেন : 'হ্যাঁ আজই তাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন।' নবীজীর মুখে এই উচ্চারণ শুনে জাফরের স্ত্রী আসমা ব্যাকুলতাভরা কান্নায় ভেসে চললেন। জাফরের অবুঝ বাচ্চাদের মুখের হাসি মুহূর্তেই বিলীন হয়ে গেলো। ফুলের মতো শিশুরা পাথরের মতো নিথর হয়ে গেলো। প্রতিবেশী মহিলারা এসে বিধবা আসমার পাশে দাঁড়ালেন। চোখ মুছতে মুছতে নবীজী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে জাফরের বাড়ির আঙ্গিনা তিনি ছেড়ে এলেন।

এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, মূতার যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার স্ত্রী ও সন্তান ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের কাছে গিয়েও সান্ত্বনা দেন। অপর এক বর্ণনায় দেখা যায় শাহাদাতের সময় তিনি কোনো সন্তান রেখে যাননি।

মূতায় অবস্থানকালে এক রাতে তিনি হৃদয়স্পর্শী একটি কবিতা আবৃত্তি করার সময় তাঁর ভাতিজা হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম কবিতাটি শুনে কাঁদতে শুরু করেন। তখন তিনি যায়েদকে দোররা দেখিয়ে কান্না থামাতে বলেন এবং আবেগময় কণ্ঠে বলেন, আল্লাহ আমাকে শাহাদাত দান করলে তোমরা নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরে যাবে।

মূতার যুদ্ধে আরো বেশ ক'জন সাহাবী শাহাদাতের সুধা পান করেন। আল্লাহ্‌র দ্বীনের ভালোবাসা, আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসার এক পবিত্র বন্ধনে তাঁদের জীবনের উচ্চতা বহু বহু ঊর্ধ্বে পৌঁছে যায়। তাঁদের সবার আত্মোৎসর্গের ইতিহাস, তাঁদের সবার গ্রহণযোগ্যতার ইতিহাস ইতিহাসেরই এক স্বর্ণালি অধ্যায় হয়ে আছে। সমর্পণের এই রক্তিম অধ্যায় তাঁদের সমৃদ্ধ আখেরাতের জন্য এক আলোকিত সিঁড়িতে

পরিণত হয়। ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী ও আস্থাশীল মানুষের জন্য উন্নীত হয় মহান এক পাঠশালায়।

মূতার তিন সেনাপতির শাহাদাতের খবর হযরত রাসূলে করীম (সা.) -এর কাছে পৌঁছার পর তিনি বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যান। রণাঙ্গণে তাঁদের আত্মত্যাগের বর্ণনা দেন এবং নাম বলে বলে দু'আ করেন– 'আল্লাহ! তুমি যায়েদকে ক্ষমা করে দাও।' একথাটি তিনি তিন বার বলেন, তারপর বলেন, আল্লাহ! 'তুমি জাফর ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে ক্ষমা করে দাও।' ⊙

[তথ্যসূত্র :
সহীহ বুখারী– পৃষ্ঠা- ৬১১; ইবনে হিশাম– ২ : ৩৭৮-৩৮০;
আল ইবাসা, পৃষ্ঠা- ২৭২]



অঙ্গীকারের মূল্য!

ইকরিমা (রা.) ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এক মহান সাহাবী। মক্কা বিজয়ের পর যে-দিন তিনি কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করে ইসলাম গ্রহণ করেন, মানবতার মহান শিক্ষক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে হাত রেখে সত্যের দীক্ষা নেন সেদিন থেকেই তিনি ছিলেন পরিবর্তিত ও উন্নীত এক মানুষ।

একই সঙ্গে ইবাদতে ইবাদতে যেমন কেটে যেত তাঁর রাত, তেমনি রণাঙ্গণে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য যখনই ডাক পড়তো খোলা তরবারি হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতেন। ইবাদতে নিমগ্ন থেকে মসজিদে কাটিয়ে দিতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতেন অত্যন্ত স্বাদ আর তৃপ্তি নিয়ে, তৃষ্ণা ও আনন্দ নিয়ে। মাঝে মাঝেই আবেগের উত্তাপ নিয়ে কুরআন শরীফ মুখের উপর ধরে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বলতেন, আমার রবের কিতাব, আমার রবের কালাম!

ইসলাম গ্রহণের দিন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সঙ্গে এক পবিত্র অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে যান। ইসলামের বিরুদ্ধে তাঁর জীবনে কৃত সব কর্মকাণ্ডের কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ দেয়ার মানসে ইসলামের জন্য ভবিষ্যতে রণাঙ্গনে, প্রচার ও সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। ইকরিমা (রা.) তাঁর এই অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির মূল্য পুরোপুরি দিয়েছিলেন। আকাশসমান আস্থা আর সিংহের মতো বীরত্ব

নিয়ে প্রতিটি যুদ্ধে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন। কালো, বিবর্ণ, ফ্যাকাসে বহু পৃষ্ঠা পার হয়ে এসে ইকরিমা (রা.) ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল ও রক্তিম একটি অধ্যায়ের অত্যন্ত উজ্জ্বল আসনটি দখল করে নেন।

দুই

কে এই ইকরিমা (রা.), কী ছিল তাঁর ইতিহাস? একটু ফিরে দেখা যাক।

ইকরিমার ইতিহাস তো কেবল তাঁরই ইতিহাস ছিল না, ইকরিমার ইতিহাসের সূচনা তাঁর পিতা আবু জেহেলের ইতিহাস থেকে। আবু জেহেলের নাম শোনেনি- এমন কোনো মূর্খ মুসলমানও সম্ভবত এ দুনিয়ায় নেই। ইসলামের বিরোধিতায় এমন প্রচণ্ড শত্রুতা ও পশুত্বের নজির সে স্থাপন করেছে যে, ইসলামের ইতিহাসের সঙ্গে নেতিবাচকভাবে তার নামটি অপরিহার্য হয়ে গেছে। বদরের যুদ্ধে মদীনার দুই কিশোর সাহাবীর আঘাত ও আক্রমণে এই ইসলামদুশমন কুরাইশনেতা নিহত হয়।

ইকরিমা যদিও শুরু থেকে ইসলামের বিরোধিতায় পিতার অনুসারী ছিলেন, কিন্তু মুসলমানদের হাতে পিতা নিহত হওয়ার পর থেকে তাঁর এই স্বাভাবিক ও পিতার অনুসরণগত ইসলামবিরোধিতার ধরনটাই পাল্টে গিয়েছিল। জেদ আর আক্রোশ তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। যুক্ত হয় প্রতিশোধের আগুন আর পিতা হারানোর জ্বালা। উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে সরাসরি কাফের-শক্তির এক শক্তিমান যোদ্ধা হিসেবেই তার ভূমিকা চিহ্নিত হয়। এ ছাড়াও যে কোনো সুযোগ ও উপলক্ষেই ইসলাম ও হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর বিরোধিতায় তাঁর মনোযোগ ও তৎপরতা ছিল সার্বক্ষণিক।

মক্কা বিজয়ের দিনটি ছিল মক্কার কাফের ও কুরাইশসর্দারদের মনোবল ভেঙ্গে পড়া ও আত্মসমর্পণ করার দিন। এ দিনটিতেও সত্যের বিজয়ের পথে প্রতিবন্ধকের ভূমিকা নিয়ে ইকরিমা লড়াইয়ে নেমে যান। শেষ

পর্যন্ত মক্কা ছেড়ে পালিয়ে যান। সমুদ্র পার হয়ে দূরের কোনো দেশে আশ্রয় নেয়ার উদ্দেশে উপকূলীয় এলাকার দিকে নীরবে, সন্তর্পণে চলে যান। এদিকে শেষ মুহূর্তেও তাঁর তীব্র ইসলামবিরোধিতার কারণে সাধারণ ক্ষমার বাইরে যে ক'জনকে রাখা হয়েছিল, কাবাঘরের পবিত্র গিলাফের নিচে আশ্রয় নিলেও যাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, ইকরিমার নামটিও সে তালিকায় ছিল। ভয় পেয়ে পালিয়ে বেড়ানোটাই ইকরিমার নিয়তি হয়ে গিয়েছিল ক'দিনের জন্য।

অপর দিকে মক্কার নেতৃস্থানীয় অপরাপর কিছু নারীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী উম্মু হাকীম ইসলাম গ্রহণ করেন। নিজে ইসলাম গ্রহণের পর পর স্বামীর জন্য মহান রাসূলের দরবারে স্বামীর নিরাপত্তার আবেদন জানালে রাসূল তা মঞ্জুর করেন। খুঁজতে খুঁজতে বহু পথ পাড়ি দিয়ে উম্মু হাকীম তাঁর পলায়নপর স্বামীকে এক নৌবন্দরে খুঁজে পান। সেখানে তাঁকে বহুভাবে বুঝান এবং ফিরিয়ে আনেন। ফেরার পথে বিভিন্ন ঘটনায় ইসলামের শিক্ষা, বিধান ও সৌন্দর্য আরো সুন্দরভাবে স্বামীর সামনে তুলে ধরেন উম্মু হাকীম।

ইকরিমা যখন সস্ত্রীক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হন তখন ইসলামের চিরশত্রু আবু জেহেল-তনয় ইকরিমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) উৎফুল্ল হয়ে স্বাগত জানান। এর আগেই ওহীর মাধ্যমে ইকরিমার সম্ভাব্য উপস্থিতির কথা জানতে পেরে নবীজী ইকরিমার বিষয়ে নীরব থাকতে এবং তার কাফের পিতাকে কোনো গালাগাল না দিতে সাহাবীগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যার ফলে সেখানে বিব্রতকর ও বিড়ম্বনাকর কোনো অবস্থার মুখোমুখি ইকরিমাকে হতে হয়নি। কেবল কিছু কোমল প্রশ্নোত্তর, কিছু আবেদন ও তার মঞ্জুরি, কিছু অভিব্যক্তি আর অঙ্গীকারের ধ্বনিই সেখানে উচ্চারিত হয়। ইকরিমা ইসলাম গ্রহণ করেন। কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করেন। নবীজীর কাছে তিনি অতীতের সব গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তার জন্য দু'আ করার আবেদন জানান। নবীজী তাঁর ক্ষমার জন্য দু'আ করেন। সদ্য ঈমান

গ্রহণকারী ইকরিমা হঠাৎ করেই প্রত্যয়ী ও দৃঢ়চেতা মুমিনের কণ্ঠস্বর ধারণ করে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য যা কিছু ব্যয় করেছি, তার দ্বিগুণ আমি আল্লাহর পথে ব্যয় করবো। আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য যত যুদ্ধ আমি করেছি, তার দ্বিগুণ যুদ্ধ আমি আল্লাহর পথে করবো।'

আল্লাহর নামে শপথ করে করা এই অঙ্গীকারের মূল্য অবশিষ্ট সারাটা জীবন ইকরিমা (রা.) দিয়েছেন। নিষ্ঠার সঙ্গেই দিয়েছেন। এমনকি জীবনটা বিলিয়ে দিয়েই দিয়েছেন।

চার

ইয়ারমুকের যুদ্ধ প্রান্তর। চারদিকে তরবারির ঝনৎকার, আহত-নিহতের আর্তনাদ, তপ্ত খুনের বন্যা আর হাহাকার। হৃদয় কাঁপানো অজস্র দৃশ্য। কিন্তু শার্দূল-হৃদয়, আত্মোৎসর্গিত ইকরিমা (রা.) ছিলেন এ সবের বহু ঊর্ধ্বে। প্রচণ্ড পিপাসায় তৃষ্ণার্ত মানুষ পানি দেখলে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে, শত্রুসৈন্যদের উপর তিনি সেভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জীবন ও নিরাপত্তার বিন্দু বিসর্গ দুশ্চিন্তার অবকাশ তাঁর ছিল না। যেদিকেই মুসলমানদের পরাজয়ের বা বিপর্যয়ের চিহ্ন ফুটে উঠছিল, ইকরিমা (রা.) সেদিকেই খোলা তরবারি নিয়ে ছুটে যাচ্ছিলেন। এ যেন ছিল মৃত্যুর দিকেই তাঁর ছুটন্ত অভিযান। ঘোড়া ও তরবারি একসঙ্গেই ছুটতে থাকে তাঁর। শত্রুসেনাদের বধ করা আর ছত্রভঙ্গ করার কাজটি অত্যন্ত সফলভাবে তিনি করে যাচ্ছিলেন। এভাবে প্রায়ই শত্রুসেনাদের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিলেন। তাঁর এ বেহিসেবী যুদ্ধপ্রবণতা দেখে সেনাপতি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) -এর মনে ইকরিমার জীবনাশংকা জেগে উঠে। তিনি ইকরিমাকে এতটা বেপরোয়া হতে বারণ করেন। তিনি ইকরিমাকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, তোমার নিহত হওয়া মুসলমানদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে।

আল্লাহর পথে উজাড় হয়ে যাওয়া ইকরিমা (রা.) তখন আলৌকিক এক উচ্চতা থেকে বলেন– 'খালিদ! আমাকে ছেড়ে দাও। তোমরা তো রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর পুরানো সঙ্গী। আমি ও আমার পিতা তো ছিলাম রাসূলের বড় শত্রু। বহু অত্যাচার, বহু লড়াই তাঁর বিরুদ্ধে করেছি। আজ আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। বহুবার রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর বিরুদ্ধে লড়েছি, আজ রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে পালিয়ে যাবো? এ আমার পক্ষে অসম্ভব!'

প্রত্যয়ী ইকরিমা একপর্যায়ে রণাঙ্গণে মুজাহিদদের উদ্দেশে আমরণ জিহাদে শরীক হওয়ার এক উদাত্ত ঘোষণা দেন। মৃত্যুর ওপর বাইআত হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দেন তাঁর চাচা হারিস ইবনে হিশাম, দিরার ইবনুল আযওয়ার। সাড়া দেন আরো চারশ' মুসলিম সৈনিক। শপথ ও বায়আতের পরই তাৎক্ষণিক জিহাদে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের নেতৃত্ব দেন হযরত ইকরিমা (রা.)। চারশ মুসলিম সৈনিক শুরু করেন এক বেহিসেবী মৃত্যুজয়ী লড়াই। ঝড়ের মতো এ ক্ষুদ্র বাহিনীটিই ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত করার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকাটি রাখেন।

পাঁচ

যুদ্ধ যখন শেষ তখন বহু শহীদ মুসলিমের লাশ যেমন খুঁজে পাওয়া যায় তেমনি রণাঙ্গণে মুমূর্ষু আহত সৈনিকদের কাতর-ধ্বনিও শোনা যায়। সে সব আহত সৈনিকের মাঝে তিন সাহাবীকে দেখা গেলো– মৃত্যুযন্ত্রণায় তাঁরা ছটফট করছেন। কাছে গিয়ে দেখা গেলো, এরা হচ্ছেন হারিস ইবনে হিশাম, আইয়াশ ইবনে আবি রাবীআ এবং ইকরিমা ইবনে আবি জেহেল (রা.)।

এদিকে আহত সৈনিকদের প্রয়োজনে যুদ্ধ শেষে পানি পান করানোর জন্য পানির পাত্র নিয়ে রণাঙ্গনে আসলেন একজন। তিনিও এ দৃশ্যটি

দেশে প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। এ সময় হারিস কাতর কণ্ঠে পানি চাইলেন। তাঁর দিকে যখন পানি এগিয়ে নেয়া হলো, তখনই মুমূর্ষু তিনজনের মাঝের জন– ইকরিমা (রা.) -এর আর্তনাদ ভেসে আসলো। হারিস তখন নিজে পানি না নিয়ে ইকরিমাকে পানি এগিয়ে দিতে ইঙ্গিত করলেন। ইকরিমার কাছাকাছি পানি নিয়ে যাওয়ার পর আইয়াশের কণ্ঠে পানির জন্য ব্যাকুল আর্তনাদ উচ্চারিত হলো। ইকরিমা (রা.) তখন নিজে আর পানি পান না করে আইয়াশকে পানি দেয়ার কথা বললেন। আইয়াশ ইবনে আবি রাবীআর কাছে পানির পাত্র নিয়ে যখন যাওয়া হলো তখন আর তিনি এই জগতের বাসিন্দা নন। পানির পাত্র নিয়ে ঘুরে আসতে আসতে ইকরিমা (রা.) এবং হারিসও দুনিয়ার সব বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেলেন। ইয়ারমুকের ধূসর প্রান্তরে একটি পানির পাত্র কেবল একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে নেয়া হলো। কাউকে পান করানো সম্ভব হলো না। অপর ভাইয়ের প্রয়োজনের ডাকে কেউ নিজে আর পানি পান করলেন না।

ছয়

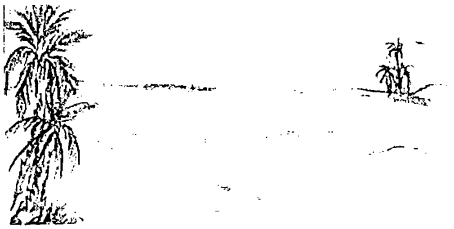
জীবন উজাড় করা যুদ্ধে ইকরিমা (রা.) শাহাদাত বরণ করলেন। জীবনের মূল্য দিয়েই আল্লাহর পথে তাঁর দৃপ্ত পদচারণার অঙ্গীকার তিনি পুরা করে দেখালেন। তাঁর সঙ্গে শাহাদাত বরণ করলেন আরো ক'জন সাহাবী। তাঁদের শাহাদাত ছিল জীবনবাজি লাগানো বায়আতের অনিবার্য সুফল। তাঁদের শাহাদাত ছিল রণাঙ্গনে আত্মোৎসর্গিত মানুষের খুনসেচা দাস্তান।

শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্তে ইকরিমা (রা.) এবং তাঁর অপর দু'সঙ্গী চরম মুমূর্ষু অবস্থাতেও অপরের প্রয়োজন ও চাহিদাকে যেভাবে মূল্য দেয়ার, প্রাধান্য দেয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন তা কেবল শাহাদাতের ইতিহাসেরই একটি অধ্যায় ছিল না, মানবিক ঔদার্য ও ভ্রাতৃত্বের এ

ছিল এক সুকঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সমৃদ্ধ অধ্যায়। শাহাদাত ও হামদর্দির যুগপৎ এক ফ্রেমের আলোকিত ক্যানভাসে তাঁদের নাম ক্ষুধাই হয়ে আছে।

আল্লাহর কী ইচ্ছা! কোথায় আবু জেহেল তনয় ইকরিমা, আর কোথায় ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ ইকরিমা (রা.)! জীবন ও হৃদয়ের অভূতপূর্ব রূপান্তরের এই সত্য গল্প দুনিয়ার ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়টিকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে। ⊙

[তথ্যসূত্র :
আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৫ : ৭৬;
আল ইসাবা, নং- ৫৬৫৪; আল ইস্তিআব- ১৮৩৮]



খোঁড়া পায়ে তিনি জান্নাতে হাঁটছেন!

জীবনের সর্বোচ্চ মূল্যই হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুর সামনে মানুষ অসহায়। সে মৃত্যু পার্থিব ও অপার্থিব যে পথেই আসুক। এ জন্য মৃত্যুর ঝুঁকি আসতে পারে এমন যে কোনো বিষয় থেকে মানুষ সযত্নে দূরে সরে থাকে। মৃত্যুর ঝুঁকি এড়িয়ে চলার জন্য মানুষকে অনেক সময় খোঁড়া অজুহাতও দাঁড় করাতে দেখা যায়। কিন্তু যাঁর কাছে মৃত্যুর অর্থই আলাদা কিছু, যাঁর কাছে মৃত্যু মানে কেবল দেহান্তর, কেবল স্থানান্তর, মৃত্যুর পরই আলাদা ও অনন্য একটি স্থায়ী সুখের ভুবন অপেক্ষা করছে বলে যিনি বিশ্বাস করেন, মৃত্যুভয় বলতে কোনো জিনিসের ছাপ আর তাঁর মনের ভেতর থাকে না। মৃত্যু থেকে বাঁচা নয়, বরং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমর হওয়ার পথেই তিনি হাজারো যুক্তি ও কারণ দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন।

পার্থিব ও বৈষয়িক জীবনের ছকবাঁধা ফ্রেমের মধ্যে এ এক অসম্ভব বিষয়। আশ্চর্য ও বিস্ময়পূর্ণ, অভূতপূর্ব বিষয়। কিন্তু অসম্ভব ও অভূতপূর্ব এ ধরনের মৃত্যুজয়ী ঘটনার নজির আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণের জীবনে বহু। উহুদের যুদ্ধে এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ ছিলেন প্রৌঢ় আনসার সাহাবী হযরত আমর ইবনুল জামূহ (রা.)। শারীরিকভাবে মারাত্মক প্রতিবন্ধী হওয়া এবং সে কারণে রণাঙ্গনে মৃত্যু বা শাহাদাতের ঝুঁকি শতভাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি উহুদের যুদ্ধে শরীক

হতে সীমাহীন আবেদন-নিবেদন করেন। এভাবে রাসূলে আকরামের অনুমতি আদায় করেন এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

দুই

প্রবীণ সাহাবী আমর ইবনুল জামূহ (রা.) ছিলেন মদীনার খাযরাজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় এক মানুষ। ইসলাম গ্রহণ পূর্বকাল থেকেই। নবীজীর মদীনায় হিজরতের আগেই তাঁর ছেলে মুয়ায সহ অন্য তিন ছেলে এবং তাঁর স্ত্রীও ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরের ইসলাম প্রচার ও দ্বীন শিক্ষা দানের সময়কালে এক পর্যায়ে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের জন্য সর্বাত্মকভাবে সমর্পিত হৃদয়ের অধিকারী সাহাবীদের মর্যাদা তিনি লাভ করেন।

নবীজীর হিজরতের দ্বিতীয় বছরে সংঘটিত বদরের যুদ্ধে তাঁর চার ছেলে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। কিন্তু সে যুদ্ধে তিনি যেতে পারেননি। বার বার যুদ্ধে শরীক হওয়ার আবেদন জানিয়েও তিনি অনুমতি লাভে ব্যর্থ হন। কারণ এর আগেই পায়ে আঘাত পাওয়ায় তিনি কিছুটা পঙ্গুত্ব বরণ করেন। স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারতেন না। এ অবস্থায় জিহাদে গেলে তো উপায় নেই। তাঁর মুজাহিদ চার ছেলে নিজেরা সেই জিহাদে শরিক হন। পিতাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাড়িতে রেখে যান। মুজাহিদ সন্তানেরা পিতার শারীরিক প্রতিবন্ধিত্বের কথা হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তুলে ধরে তাঁকে সেবার যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত রাখেন।

কিন্তু উহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর তীব্র জিহাদ-আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্পের মুখে ছেলেদের কোনো চেষ্টায় আর কাজ হয়নি। বদরের যুদ্ধের মতো এ যুদ্ধেও ছেলেদের বাধার কারণে হয়তো যোগ দিতে পারবেন না– এ অনুমান করেই তিনি ছেলেদের ডেকে আগে ভাগেই বলে দিলেন, 'এ যুদ্ধে আমি যাবই। বদরের যুদ্ধে তোমরা আমাকে যোগ দিতে দাওনি। এ যুদ্ধে আমি আর তোমাদের কোনো বাধা মানবো না।' ছেলেরা তাঁর

অক্ষমতার কথা তুলে ধরে নানাভাবে তাঁকে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকার জন্য জোর দিতে থাকেন। তিনি তাঁদের কোনো কথাতেই কান না দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সামনে উপস্থিত হয়ে যান। এরপর তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ আর আবেগ একসঙ্গে উপুড় করে ঢেলে দেন। তিনি বলেন, 'ছেলেরা আমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে চাচ্ছে না। আল্লাহর কসম! এ খোঁড়া পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতেই আমি জান্নাতে যেতে চাই।'

দয়ার সাগর নবীজীও শারীরিক মাযুরির কারণে তাঁর ওপর জিহাদ ফরয না হওয়ার কথা বলে যুদ্ধে যেতে তাঁকে নিরুৎসাহিত করেন। কিন্তু যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তিনি অটল হয়েই থাকেন। কোনো বুঝ, প্রবোধ বা যুক্তিই তাঁর পবিত্র আবেগের সামনে টিকতে পারে না। তিনি যে কোনো মূল্যে যুদ্ধে যাবেনই, তাঁর এ মনোভাব বুঝতে পেরে নবীজী তাঁর ছেলেদের বললেন, 'তাঁকে আর বাধা দিও না। আল্লাহ পাক হয়তো তাঁকে শাহাদাত দান করবেন।' কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়, যুদ্ধযাত্রার আগে খোঁড়া হয়ে যাওয়া এই প্রৌঢ় মুজাহিদ সাহাবী বিগলিত হৃদয়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন, 'ইয়া আল্লাহ! আমি জিহাদে যাচ্ছি। তুমি আর আমাকে মদীনায় ফিরিয়ে এনো না।'

তিন

উহুদ যুদ্ধ শুরুর মুহূর্ত থেকেই হযরত আমর ইবনুল জামূহ জীবনের সব মায়া ও বন্ধন ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। এরপর যুদ্ধের মোড় যখন কিছুটা ঘুরে যায়, মুসলিম যোদ্ধারা কিছুটা বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ে যান, কাফের সৈনিকরা নানাদিক থেকে মুসলমানদের চেপে ধরতে থাকে, তখন তিনি যেন যুদ্ধে আরও মরিয়া হয়ে ওঠেন। সব নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও কলা কৌশলের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে মুজাহিদ ছেলে খাল্লাদকে সঙ্গে নিয়ে কাফেরদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হন। তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে খোঁড়া পা নিয়েই সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে অস্ত্র

চালিয়ে যেতে থাকেন। এক পর্যায়ে শত্রুপক্ষের পরিকল্পিত আক্রমণে ছেলেসহ তিনিও আক্রান্ত হন। অল্পক্ষণের মধ্যেই যুবক ছেলে খাল্লাদসহ প্রৌঢ় এই মুজাহিদ শাহাদাতের বিছানায় না ভাঙ্গা এক অনন্ত ঘুমে ডুবে যান।

যুদ্ধ শেষে রক্তাক্ত রণাঙ্গণে শহীদ যোদ্ধাদের লাশ খুঁজে খুঁজে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। দেখা গেলো, হযরত আমর ইবনুল জামূহের লাশ উহুদের ধুলায় পড়ে আছে। রাসূলে আকরাম (সা.) পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে লাশটি দেখেই চিনতে পারলেন। তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রত্যয় ও সংকল্পে গভীর এই শহীদ মুজাহিদের লাশের দিকে তাকিয়ে নবীজী বললেন, 'আল্লাহ তাঁর কোনো কোনো বান্দার কসম পুরা করেন। আমর তাঁদেরই একজন। আমি দেখতে পাচ্ছি, জান্নাতে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলছে।'

চার

উহুদের যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকে জোড়ায় জোড়ায় করব দেয়া হয়েছিল উহুদ প্রান্তরেই। এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা হওয়ার আগেই হযরত আমরের ছেলেরা তাঁর লাশ মদীনায় আনার জন্য একটি উটে উঠান। কিন্তু এ লাশটি নিয়ে মদীনার দিকে উটটি চলতে চায় না। বহু চেষ্টা করেও উটটিকে মদীনার দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়, উটটি বার বার ঘাড় ঘুড়িয়ে দিচ্ছিল। এ যেন এক অস্বাভাবিক অবাধ্যতা। উটের এই আচরণের কোনো কারণই প্রথমে বোঝা যাচ্ছিল না।

পরে খোঁজ নিয়ে যখন জানা গেলো, হযরত আমর ইবনুল জামূহ (রা.) মদীনা থেকে যুদ্ধযাত্রার আগেই মদীনায় ফিরে না আসার জন্য দু'আ করেছিলেন, তখন সবাই বুঝে যান তাঁর এ দু'আটিও কবূল হয়ে যায়। প্রাণ নিয়ে তো নয়ই, তাঁর প্রাণহীন দেহটিকেও রণাঙ্গণ থেকে বাড়িমুখি করা যায়নি।

এ ছিল জিহাদের মধ্য দিয়ে শাহাদাত এবং শাহাদাতের মধ্য দিয়ে জান্নাতে প্রবেশের এক পরিকল্পিত আত্মিক প্রস্তুতির ইতিহাস। এ ছিল জীবনের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার ঊর্ধ্বে অপর এক সুন্দর সুখী জীবন বরণ করে নেয়ার কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যয়দীপ্ত পদক্ষেপ। এ ছিল ইহজীবনের ক্ষণিকতা ও ক্ষয়িষ্ণুতাকে উপলব্ধি করে অমর ও ক্ষয়হীন এক অনন্ত জীবনকে আপন করে নেয়ার সাহসী সিদ্ধান্ত, দৃঢ়চেতা শপথ।

মহান আল্লাহ খোঁড়া হয়ে যাওয়া এক সাহাবীর এই পবিত্র প্রস্তুতি, পদক্ষেপ আর শপথকে মঞ্জুর করে নিয়েছেন। ইতিহাসের লাল আস্তিনে তাঁর উজ্জ্বলতার ইতিহাস ও স্বর্ণালি বর্ণমালায় লেখা হয়ে আছে। ⊙

[তথ্যসূত্র :
আল ইসাবা নং- ৫৭৯৯;
ইবনে হিশাম- ২ : ৯০]



ফোরাতের তীরে

আর কোথায় যাওয়া যায়? আর কী করা যায়? হযরত হোসাইন (রা.)-এর পক্ষে আরও কিছু করা কি সম্ভব?

হিংস্রতা ও নৃশংসতার অভিশপ্ত গাঁথুনি দিয়ে নির্মিত এক-একটি বাধার প্রাচীর তাঁর সামনে। মানবিকতার কোমল অনুভূতির গোরস্তান হয়ে গেছে মরুভূমি। কোথাও সমব্যথী মানুষের সন্ধান নেই। কোথাও মমতা, দরদ আর সত্য ও অধিকারের প্রতি টান নেই। চারদিকে নিঃসীম শূন্যতা ও বেদনার হাহাকার। পরিবার-পরিজন নিয়ে গুটিকয় নিবেদিত শুভার্থী মানুষের কাফেলা থেমে পড়লো হোসাইনের নির্দেশে। আবদ্ধ ও শত্রুসেনা বেষ্টিত হোসাইন শেষ পর্যন্ত তৃণ-গুল্মহীন শুষ্ক প্রান্তর কারবালায় এসে থেমে পড়তে বাধ্য হলেন। জনপদহীন, পানির উৎসবিহীন এক আদিগন্ত হাহাকারের কারবালা।

ইয়াযিদ নিযুক্ত কুফার গভর্নর উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের সরাসরি নির্দেশে সহস্র সেনার একটি দল নিয়ে হোর ইবনে ইয়াযিদ ইমাম হোসাইন (রা.)-কে এই নির্মম চাটানে এসে তাঁবু গাড়তে বাধ্য করলো। শিশু-নারী আর সরল একদল মানুষের জীবনাশঙ্কায় ভীষণ বিমর্ষ হোসাইন, বিপন্ন হোসাইন বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শ্যাওলাধরা একেকটি পাটাতনে আছড়ে পড়তে পড়তে অবশেষে এই কারবালায় এসে নিরুপায় ও অবরুদ্ধতার এক উন্মুক্ত জিন্দানখানায়

বন্দি হয়ে গেলেন। অথচ এমন তো হওয়ার কথা ছিল না! হক্বের পক্ষে, সঠিক খেলাফত প্রতিষ্ঠার তাগিদে পবিত্র হেজাযে তাঁর কাছে কুফায় যাওয়ার এতসব পয়গাম, এতসব পত্রের জবাব তো এভাবে আসার কথা ছিল না!! কিন্তু নির্মমতা ও বিশ্বাসঘাতকতার এ বিশাল এক প্রান্তরে এসে তিনি এমনভাবেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন যে, সব অসম্ভবই এখন সম্ভব হয়ে উঠতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন।

দুই

ইয়াযিদ খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর থেকে হেজাযের যে ক'জন শীর্ষ ও সম্মানিত সাহাবী তার খেলাফত ও নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে আসছিলেন, ইমাম হোসাইন (রা.) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। উপরন্তু তাকওয়া, যোগ্যতা, ন্যায়পরায়ণতা ও অধিকারের দিক থেকে হযরত হোসাইন (রা.)-কেই খেলাফতের সর্বাধিক উপযুক্ত মনে করা হতো তখন। দেখতে দেখতে ইসলামী খেলাফতের তৎকালীন কেন্দ্রীয় অঞ্চল– কুফা থেকে হযরত হোসাইনকে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য কুফায় আগমনের আহ্বান আসতে থাকে। শাসক ইয়াযিদের অযোগ্যতা, দুঃশাসন, উৎপীড়ন এবং তার নিযুক্ত প্রশাসক ও রাজকর্মচারীদের মাত্রাতিরিক্ত জুলুম ও অবিচারের কারণে বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মুসলমানরা। ক্ষুব্ধ মুসলমান জনসাধারণ হযরত হোসাইন (রা.)-কে খলীফা হিসেবে এগিয়ে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে ইয়াযিদের কেন্দ্রীয় দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দূত, চিঠি এবং আবেগঘন সব পয়গাম পাঠাতে থাকে।

জান্নাতের যুবকদের নেতা হযরত হোসাইন (রা.) ছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র, হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা-তনয় (রা.)।

তাঁর নানা রাসূলে আকরাম (সা.)-এর স্নেহ, আদর আর আম্মা-আব্বার মমতায় পবিত্র এক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠেন তিনি। নির্লোভ, নিরহঙ্কার ও খোদাভীরু হযরত হোসাইন (রা.) ইসলামী খেলাফতের প্রতিষ্ঠা এবং মজলুম মুসলমানদের মুক্তির লক্ষ্যে খলীফা হিসেবে তাঁর অধিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে ভাবতে লাগলেন। শীর্ষ সাহাবী ও শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ হলো এরপর। এসব পরামর্শে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.)-সহ বিশিষ্ট ক'জন সাহাবী হযরত হোসাইনকে সম্ভাব্য প্রতিকূলতার কথা বলে কুফায় যেতে বার বার নিষেধ করার পরও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল থাকলেন। ইতোমধ্যে কুফার পরিস্থিতি যাচাই ও প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনে আকীলকে আগেভাগেই কুফায় পাঠিয়ে দিলেন হোসাইন (রা.)। মুসলিম ইবনে আকীল কুফায় পৌঁছার পর তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করতে লাগলো হাজার হাজার মানুষ। মুসলিম ইবনে আকীল কুফার জনসাধারণের এই অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ততার কথা জানিয়ে হযরত হোসাইনকে চিঠি দিয়ে খবর পাঠালেন। অতিসত্বর তাঁকে কুফায় চলে আসার আহ্বান জানালেন।

এরপর হযরত হোসাইন (রা.) সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব অতিক্রম করে কুফার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলেন। হিজরী ষাট সনের যিলহজ্ব মাসে শুরু করে দেয়া এই সফরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন পরিবার-পরিজন, শিশু-নারীসহ প্রায় শ'খানেক সফরসঙ্গী। একটি অনুকূল গন্তব্য-অভিমুখে পরিচালিত এই সফর শেষ পর্যন্ত বিপুল রক্ত আর বেদনার এক গন্তব্যে এসে সমাপ্ত হয়। দুনিয়ার তাবৎ নির্দয়তা ও নির্মমতার এক দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় এসে দাঁড়ায় হযরত হোসাইনের সামনে। কারণ কুফায় হযরত হোসাইনের দূত মুসলিম ইবনে আকীল হযরত হোসাইনকে কুফার জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত বাইআত ও সংবর্ধনার খবর পাঠানোর পরপরই ঘটে যায় অন্য ঘটনা। শাসক ইয়াযিদের পক্ষ থেকে কুফায়

গভর্নরের পরিবর্তন ঘটানো হয়। নতুন গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হয়ে কুফায় আসে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ; হিংস্রতা ও নির্মমতার এক সাক্ষাৎমূর্তি। প্রতিশোধ ও পাশবিকতার এই প্রতিমূর্তি কুফায় এসে হাজির হওয়ার অল্প কয়েকদিন পর মুসলিম ইবনে আকীলকে প্রকাশ্যে হত্যা করে সে। হযরত হোসাইনের প্রতি অনুগত ও আনুগত্যে উৎসাহী মানুষের হৃদয় ভয়ে, শঙ্কায় ও অস্থিরতায় এবার উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি যেন হয়ে যায় মরু উপত্যকায় কোনো বালকের উদ্দাম খেলাধুলার এক তুচ্ছ উপাদান। মানুষ ভুলে যায় মানবতা। মানুষ ভুলে যায় বিশ্বাস। মানুষ ভুলে যায় প্রতিশ্রুতি। বিশ্বাস ও বিশ্বাসঘাতকতার সীমারেখা কুফার জনসাধারণের অনুভূতি থেকে হঠাৎ আসা- হঠাৎ যাওয়া লু হাওয়ার মতোই হারিয়ে যায়।

তিন

কিন্তু হেজায থেকে রওয়ানা দেয়ার সময় এসব প্রতারণা ও ধোঁকার আয়োজনের বিষয়ে হোসাইন (রা.) ছিলেন সম্পূর্ণ অনবহিত। প্রশান্ত মনে সপরিবারে ও সদলবলে বেশ কিছুদূর এগিয়ে আসার পর হযরত হোসাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো কবি ফেরাযদকের। ফেরাযদক তাঁকে জানালেন, কুফার জনসাধারণের হৃদয় আপনার সঙ্গে থাকলেও তাদের তরবারি রয়েছে আপনার বিপক্ষ দলের সঙ্গে। আরো কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর তিনি জানতে পারলেন, তাঁর দূত ও প্রতিনিধি মুসলিম ইবনে আকীলকে হত্যা করা হয়েছে। হোসাইন (রা.) সফরের পথে দ্বিতীয় ধাক্কাটি খেলেন। অনাকাঙ্ক্ষিত রক্তক্ষয়ের আশঙ্কায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও ফিরে যাওয়ার আর সুযোগ থাকলো না। মুসলিম ইবনে আকীলের আত্মীয়-পরিজন বেঁকে বসার কারণে ফিরে যাওয়ার ভাবনা হোসাইন বাদ দিলেন এবং একটি রক্তাক্ত পরিণতির আশঙ্কা তাঁর মনে স্থান গেড়ে নিলো। পথ চলতে চলতে হোসাইন (রা.) যখন কাদেসিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করলেন, তখন কুফার

শাসনকর্তা উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কর্মচারী হাসিম ইবনে নোমাইর তামিমীর তরফ থেকে হোর ইবনে ইয়াযিদ এক হাজার সৈন্য নিয়ে হাজির হলো এবং উপরের নির্দেশমতো হযরত হোসাইনের পেছনে সে সদলবলে লেগে রইল। গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করতে করতে এবং নিয়ন্ত্রিত হতে হতে অবশেষে কারবালায় এসে থামলো দুটি কাফেলা। একটি মানুষ ও মানবতার কাফেলা। অপরটি মানবিকতা ও সভ্যতাবিরোধী পাশবিকতার কাফেলা।

আসার পথে কয়েক জায়গায় হোসাইন (রা.) সততা ও ন্যায়ের এক-একটি অমোঘ বিষয় তুলে ধরে বক্তব্য রাখলেন। নিজের পরিবার-পরিজনসহ শত্রুসেনাদের সামনেও ইসলাম ও ইসলামী খেলাফতের প্রয়োজনে নিঃস্বার্থ সংগ্রাম এবং মানবতা ও মানবীয় শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপরাধের মুখোমুখি রুখে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরলেন। এক জায়গায় তিনি বললেন– 'পরিস্থিতি কোথায় গেছে, তা তোমরা অনুধাবন করছো। দুনিয়া শূন্য হয়ে গেছে। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পুণ্য থেকে জগৎ শূন্য হয়ে গেছে। সামান্য অংশ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আমার তুচ্ছ জীবন এখনো বাকি আছে। চারদিকে বিভীষিকা পাখা বিস্তার করে আছে। আক্ষেপের বিষয়, তোমরা কি দেখছো না যে, সত্য পেছনে ফেলে দেয়া হয়েছে আর অন্যায়-অসত্যের ওপর প্রকাশ্যে আমল করা হচ্ছে? এমন কেউ নেই, যে আজ সত্যের প্রতি হাত এগিয়ে দেয়? সময় এসেছে যখন মুমিন সত্যের পথে আল্লাহর ইচ্ছা কামনা করবে। কিন্তু আমি শহীদের মৃত্যুই কামনা করি। জালেমের সঙ্গে জীবিত থাকাই একটি মহাপাপ।' এ সব হৃদয় উজাড়-করা বক্তব্য ইমাম হোসাইনের অনুসারী ও অনুগতদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা, সংশয়হীনতা ও সাহসের দীপ্তি জাগিয়ে তুললেও বিরোধী পক্ষের পাশবিকতাকে সামান্যতমও কমাতে পারেনি।

চার

হযরত হোসাইন (রা.) কারবালা প্রান্তরে শিবির স্থাপনের দ্বিতীয় দিন উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের পক্ষ থেকে আমর ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ইয়াযিদ বাহিনীর পক্ষে চার হাজার সৈন্য হাজির হলো। পরিস্থিতি রক্তক্ষয় ও অভিশাপের এক ভয়াবহ মোড়ে এসে পৌঁছালো। এরই মধ্যে পাঁচশ' সৈন্য গিয়ে নদীর তীরে পাহারা বসালো যেন হোসাইন-অনুসারীদের কেউ সেখানে পৌঁছুতে না পারে। সঙ্গী-সাথী ও শিশু-নারীদের কথা ভেবে হযরত হোসাইন (রা.) তখন তিনটি প্রস্তাব দিলেন–

১. যেখান থেকে এসেছি সেখানে ফিরে যেতে দাও।
২. স্বয়ং ইয়াযিদের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দাও।
৩. মুসলমানদের কোনো লোকালয়ে আমাকে পাঠিয়ে দাও।

কিন্তু উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের পক্ষ থেকে আগত সেনাবাহিনী ও সেনানায়করা উপরের নির্দেশে এসব প্রস্তাবে আমল দিলো না। তারা ইয়াযিদকে খলীফা হিসেবে মেনে নিয়ে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিলো হযরত হোসাইন (রা.)-কে। অবিচল ও অটল হোসাইন (রা.) এমন প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হলেন না। আপস এবং যেনতেনভাবে মেনে নেয়া ও জান বাঁচানোর প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করলেন তিনি।

পাঁচ

শুরু হলো অন্ধকার ও আলোর দ্বন্দ্ব। শুরু হলো মানবতার এক আল্লাহমুখী ফরিয়াদ। একদিকে বালুকারাশির মাঝে শুদ্ধতা ও ইনসাফের গুটিকয় তাঁবু, অপরদিকে সেই তাঁবুর দিকে জ্বলজ্বলে হিংস্র চোখ তীরের মতো এসে বিঁধতে থাকলো। মুহররমের নবম তারিখের রাত। মীমাংসা ও রক্তক্ষয় বন্ধের সব আয়োজন যখন বন্ধ হলো,

হযরত হোসাইন ও তাঁর পরিবার-সাথীদের মৃত্যু এবং শাহাদাত যখন অনিবার্য হয়ে গেলো তখন তিনি নিমগ্ন হয়ে পড়লেন গভীর ইবাদতে। এভাবে প্রায় গোটা রাত পার হয়ে গেলো। দেখতে দেখতে, শঙ্কায় শঙ্কায় ভোর হলো। আমর ইবনে সা'দ প্রথমেই ধনুক উঠালো। পাশবিকতা ও হিংস্রতার তীর ছুঁড়ে দিলো হোসাইনের তাঁবুর দিকে। শুরু হলো লড়াই। চাপিয়ে দেয়া লড়াই। শকুন ও পিশাচের লাশ নিয়ে উৎসবের মতো হত্যার উৎসবে ইয়াযিদ-বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো। তীর, বর্শা ও তরবারির আঘাতে আঘাতে হোসাইন-অনুগত অমিততেজী সাহসী যুবক-কিশোররা জীবন উৎসর্গ করলেন। সদ্যোজাত এক শিশুকেও বর্শার আঘাতে হত্যা করা হলো। ইতিহাস যেন কাঁদতে কাঁদতে কারবালা প্রান্তে এসে লুটিয়ে পড়লো।

হিজরী একষট্টি সনের দশই মুহররম হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-কে ঘিরে দাঁড়ালো ইতিহাসের নির্বোধ খলনায়কেরা। চারদিক থেকে শুরু হলো আক্রমণ। সন্তান হারানো, ভাতিজা হারানো, বন্ধু ও স্বজন হারানোর পর দুঃসহ ও বেদনাবহ মুহূর্তেও এক আকাশ ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে অমিততেজে ইমাম হোসাইন (রা.) তরবারি চালাতে লাগলেন। হাজার হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে একজন। মাত্র একজন! দুনিয়ার হাজার পাতকীর বিরুদ্ধে বেহেশতী যুবকদের এক নেতা। আঘাতের উপর আঘাত চলতে লাগলো। এক সময় ভীষণভাবে পিপাসার্ত হয়ে তিনি পানির জন্য ফোরাতের তীরে গিয়ে হাজির হলেন। পানির বদলে বর্শা এসে তাঁর কণ্ঠদেশে বিদ্ধ হলো। তাঁর দু'হাত রক্তে লাল হয়ে গেলো। আপসহীন হোসাইন, বীরপুরুষ হোসাইন আকাশের দিকে দু'হাতের রক্ত ছিটাতে ছিটাতে বললেন– 'ইলাহী! আমার সব অভিযোগ একমাত্র তোমারই দরবারে। দেখ দেখ, তোমার রাসূল-দৌহিত্রের সঙ্গে কী ব্যবহার করা হচ্ছে!'

ছয়

আহা হোসাইন! আহা কারবালা!!

সময় বয়ে চললো। ইতিহাস বয়ে চললো। বেদনা বয়ে চললো। শেষ পর্যন্ত এক পাতকী এসে হোসাইনের পার্শ্বদেশে তরবারি চালালো। আরেক পাকতী এসে বর্শা মারলো। ইমাম হোসাইন লুটিয়ে পড়লেন। শিমার যিল জুশান হোসাইনকে হত্যার জন্য সবাইকে নির্দেশ দিতে লাগলো। অবশেষে সিনান ইবনে আনাস নাখয়ী নামের এক দুর্বৃত্ত এসে হযরত হোসাইনের দেহ থেকে মাথা কেটে আলাদা করে ফেললো। তারপর হযরত হোসাইনের দেহকে ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে আঘাতে কারবালার বালিতে মিশিয়ে দেয়া হলো। 'কারবালা'ই ঘটে গেলে কারবালায়।

মনুষ্যত্ব ও সভ্যতা হোঁচট খেতে খেতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ইতিহাসের এক লাল আস্তিনে। ছাইবর্ণ বেদনার নেকাব ঢেকে দিলো সব ঈমানদারের হাস্যোচ্ছল দিল, যয়নব আর যয়নুল আবেদীনদের অশ্রুঝাপসা মুখ। ⊙

[তথ্যসূত্র : আল ইসাবা নং- ১৭২৯,
আল বিদায়া– ৫ : ৬৫৪]



এক্ষুণি লড়াই

যৌবনের উদ্দাম আর প্রাণময়তার কথা সবাই জানে। যে কোনো প্রাণীর জীবনেই যৌবন তার বিকাশ ও চাঞ্চল্যের সবচেয়ে মুখ্য সময়; মানুষের জীবনে তো অবশ্যই।

হানযালা, হযরত হানযালা ইবনে আবি আমের (রা.) তখনই এক যুবক। মদীনার আউস গোত্রের একটি শাখার লোক। ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যদিও তার পিতা আবু আমেরের ইসলামবিরোধিতার বহু প্রয়াস ইতিহাসের পাতা কালো করে রেখেছে। ইসলাম গ্রহণের পর হানযালা (রা.) তাঁর পিতার ইসলাম-দুশমনীর জন্য দু একবার পিতাকে হত্যার অনুমতিও চেয়েছিলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। কিন্তু মানবতার নবী তাঁকে অনুমতি দেননি।

হিজরী তৃতীয় সনে যেদিন উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার অল্প কিছুদিন আগেই তিনি বিয়ে করেছেন। ইতিহাসের কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়, যুদ্ধের দিনটিতেই তার বাসর হচ্ছিল, কেউ কেউ বলেন, বাসরের দিন না হলেও বিয়ের একদম শুরুর দিককার একটি দিন ছিল সেদিনটি।

তিনি একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। মদীনার যুদ্ধ উপযোগী সব যুবক-তরুণ ও মধ্য বয়সীরাও উহুদ প্রান্তরে যুদ্ধের জন্য ছুটে গেছেন। যুদ্ধ প্রস্তুতিকালে নিজেদের সমর্পণ করে দিয়ে জিহাদে শরীক হওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু হানযালা (রা.) কোনো কারণে সেই

প্রস্তুতি পর্বে ছিলেন না, জিহাদেও অন্য সবার সঙ্গে যেতে পারেননি তিনি। জিহাদ যখন শুরু হয়ে গেছে কিংবা জিহাদের সবচেয়ে জটিল ও বিপর্যয়কর পর্যায়টি যখন চলছিল, যুবক ও নব বিবাহিত হানযালা (রা.) তখন ছিলেন তাঁর স্ত্রীর শয্যায়।

শয্যা থেকে উঠে যখন মাত্র পাক-পবিত্র হওয়ার জন্য গোসলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, কেউ কেউ বলেন তার নবপরিণীতা স্ত্রী তাঁর মাথায় পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন, তখনই মদীনার সক্ষম প্রতিটি মুসলিমকে ঘর থেকে বের হয়ে রণাঙ্গণে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানিয়ে মদীনার গলিতে গলিতে একজন ঘোষক ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হানযালা (রা.) পবিত্রতার জন্য গোসল করার কাজটি আর সম্পন্ন করতে পারলেন না। তাঁর হৃদয়ের ভেতর জিহাদে অনুপস্থিতির আক্ষেপ আর তাতে শরিক হওয়ার অদম্য আগুন এক সঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

আর দেরি নয়, এক্ষুণি! এক্ষুণি শরিক হতে হবে জিহাদে। মনের ভেতর পবিত্র চেতনার লেলিহান শিখা নিয়ে খোলা তরবারি হাতে সেখান থেকেই ছুটলেন তিনি।

দুই

জিহাদের প্রান্তরে তখন তুমুল লড়াই। এক দৌড়ে তিনি রণাঙ্গণে প্রবেশ করলেন। তাঁর এই তীব্র দৌড় ও রণাঙ্গন প্রবেশের চিত্রটি এমন ছিল যে, মুহূর্তের মধ্যেই যেন তিনি হাজার হাজার তরবারির নিচে হারিয়ে গেলেন, একদম নিখোঁজ হয়ে গেলেন। নব বিবাহিত এই যুবক সাহাবীর চোখের সামনে থেকে জীবন ও যৌবনের সব মায়া আর বন্ধনও মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেলো।

উহুদ যুদ্ধে বীর বিক্রমে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে লড়তে লড়তেই এক পর্যায়ে তিনি তৎকালীন মক্কার এক কাফেরসর্দারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হন। যখন তিনি কাফের সর্দারকে কুপোকাত করার ব্যবস্থা পাকা

করে ফেলেছেন তখনই অপরদিক থেকে মুহূর্তের মধ্যেই এগিয়ে আসা আরেক কাফের সেনা তাঁকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে। এই আঘাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। যুবক সাহাবী হানযালা (রা.) আল্লাহর পথে তাঁর জীবনটাকে এভাবেই বিলিয়ে দেন।

তিন

উহুদের যুদ্ধ যখন শেষ তখন এক করুণ বেদনার সুর বেজে উঠে মুসলিম শিবিরে। ইসলামের জন্য নিবেদিত এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ক'জন সাহাবী এই জিহাদে শাহাদাত বরণ করেছেন। শোকাভিভূত হৃদয় ও অশ্রুভেজা চোখে সব শহীদের দাফন-কাফনের প্রস্তুতি চলছিল।

শহীদ হানযালার লাশের দিকে তাকিয়ে নবীজী দেখলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য, অলৌকিক দৃশ্য। ফেরেশতারা এসে তাঁকে গোসল করিয়ে দিচ্ছেন। এ দৃশ্য অন্য কারো চোখে পড়ার কথা নয়। নবীজী অবাক করা এ দৃশ্যটির কথা উপস্থিত সাহাবীদের জানালেন। উপস্থিত এক সাহাবী আবু সাঈদ সাঈদী (রা.) নবীজীর মুখে একথা শুনে কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারেননি। তিনি এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, হযরত হানযালার মাথা থেকে পানি টপ টপ করে ঝরে পড়ছে, সদ্য গোসল শেষে যেমন মাথা থেকে পানি ঝরতে থাকে।

ইসলামের বিধান হচ্ছে, রণাঙ্গনে শহীদ হয়ে যাওয়া মানুষকে গোসল ছাড়াই কাফন-দাফন করতে হবে। তার গায়ের শাহাদাতের খুন তার সঙ্গেই থাকবে। তারপরও হানযালা (রা.) -এর ক্ষেত্রে ফেরেশতাগণের উদ্যোগে এই গোসল সমাপনের রহস্যটি জানার জন্য শহীদ হানযালার বিধবা স্ত্রীকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন দয়ার নবী। কোমল ভাষায় শহীদ হানযালা (রা.) -এর স্ত্রী জানালেন, আমরা এক শয্যায় থাকার কারণে আমার স্বামী স্বাভাবিক ভাবেই না-পাক ছিলেন। তিনি গোসল করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমি কেবল তাঁর মাথা ধুয়ে দিয়েছি, তখনই

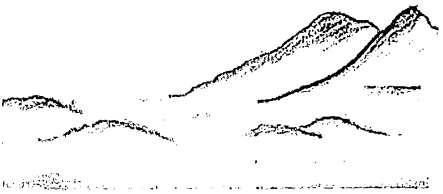
জিহাদে যোগ দেয়ার ঘোষণা শোনা গেলো, আর অমনি তিনি তরবারি হাতে নিয়ে ছুটলেন। সবাই বুঝতে পারলেন, নাপাক অবস্থাতেই যেন এই শহীদের দাফন সম্পন্ন না হয়ে যায়– তার জন্যই ছিল ফেরেশতাগণের এই উদ্যোগ।

চার

নতুন বিয়ে হওয়া এই টগবগে যুবক ছিলেন আগে থেকেই আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের প্রতি সমর্পিত। দুনিয়ার জীবনটাই তাঁর কাছে বড় জীবন ছিল না। জিহাদ ও শাহাদাতের অনন্ত সৌভাগ্য আর আল্লাহপ্রেমের অমোঘ টানটাই তাঁর দু'চোখের সামনে ছিল। তাঁর বুকটা জুড়ে ছিল ঈমানের উত্তাপ। মুহূর্তকাল আগে যিনি ছিলেন দুনিয়ার জীবনের সবচেয়ে সুখের পেলব কোমল বিছানায়, মুহূর্তকাল পরেই তাঁর দৃশ্যমান বিছানা হলো উহুদের ধূ-ধূ বালিরাশি, উহুদের লাল সাগর। তাঁর এই অপূর্ব উৎসর্গের জন্যই ফেরেশতা কর্তৃক গোসলকৃত বা 'গাসীলুল মালাইকা' উপাধিটি তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

হানযালা (রা.) উহুদের প্রান্তরে শান্তির সঙ্গে শুয়ে আছেন। আল্লাহর পথে নিখাদ উৎসর্গের কোনো ডাক এলে মুহূর্তের মধ্যেই সব পার্থিব সুখ ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলার যে গতি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন- সে গতির উত্তাপ কি সহসাই থেমে যেতে পারে? ⊙

[তথ্যসূত্র : আল ইসাবা, পৃষ্ঠা- ৪০৯;
ইবনে হিশাম– ২ : ৭৫]



বিপরীত আকাঙ্ক্ষার কথা

যুদ্ধ মানেই নিজের বিজয় এবং শত্রুপক্ষের পরাজয় কামনা। যুদ্ধের কারণও এটি, যুদ্ধের ধারাও এই। শেষ ফলাফল যা-ই ঘটুক, যুদ্ধমান দুটি পক্ষের প্রত্যেকেরই আকাঙ্ক্ষাটি এ রকমই থাকে এবং এ-রকম থাকাটাই স্বাভাবিক। এ যুদ্ধ পার্থিব বিষয়ের হোক, হোক অপার্থিব কোনো আদর্শের। দ্বীনের জন্য নিবেদিত নিষ্ঠাপূর্ণ জিহাদের মাঝেও এ চেতনাই থাকে মুখ্য। কিন্তু যুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত এ ধারার সম্পূর্ণ উল্টো চিন্তা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এক মহান সাহাবী।

এই উল্টোর অর্থ আবার পরাজয় নয়। দলগতভাবে পরাজয় কামনা তিনি করেননি। তার প্রশ্নও উঠে না। মুসলমানদের বিজয় কামনার পাশাপাশি তাঁর নিজের জীবনে শাহাদাত বা দৃশ্যমান মৃত্যু এবং করুণ মৃত্যুই কার্যকর হয়ে ওঠুক– এই প্রত্যাশা ও চেতনাই তাঁর মাঝে ছিল প্রবল। এর কারণও অন্য কিছু ছিল না, ছিল শহীদ হওয়ার মর্যাদা লাভ, শাহাদাতের মধ্য দিয়ে পরকালীন সাফল্য অর্জন। এ সাহাবীর নাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)।

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, উহুদ যুদ্ধের একদিন আগে আমি আর আবদুল্লাহ দু'আ করলাম। আমাদের মাঝে কথা ছিল, আমার দু'আর সময় সে আমীন বলবে আর তার দু'আর সময় আমি আমীন বলবো। আমার ভাষা ছিল– 'হে আল্লাহ! আগামীকাল যে দুশমন আমার সঙ্গে লড়াই করবে সে যেন অত্যন্ত সাহসী ও রাগী হয়।

যাতে তোমার পথে আমি তাকে হত্যা করে তার অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিতে পারি।' আমার এ দু'আ শুনে আবদুল্লাহ আমীন বলেন। তারপর দু'আ শুরু করেন। দু'আর মাঝে তিনি বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে এমন প্রতিদ্বন্দ্বী দান করো, যে হবে ভীষণ সাহসী ও ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন। আমি তোমার পথে তার সঙ্গে যুদ্ধ করবো। সে আমাকে হত্যা করে আমার নাক, কান কেটে ফেলবে। যখন আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো এবং তুমি জিজ্ঞেস করবে, আবদুল্লাহ তোমার নাক-কান কীভাবে কাটা গেলো? তখন আমি বলবো, তোমার ও তোমার রাসূলের জন্য।' তিনি যেন দৈব দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলেন, তাঁর এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে চলেছে। তাই বারবার কসম খেয়ে বলছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নামের শপথ করে বলছি, আমি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবো এবং সে আমাকে হত্যা করে আমার নাক-কান কেটে আমার আকৃতি বিকৃত করবে।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের এই দু'আ শুনে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস হতভম্ব হয়ে গেলেও শর্ত অনুযায়ী আমীন বলতে বাধ্য হলেন।

দুই

আশ্চর্য ও অবাক করা এই দু'আকারী ও আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী আবদুল্লাহ হলেন হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাতো ভাই। নবীজীর ফুফু উমায়মার ছেলে এবং নবীজীর সহধর্মীণি হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের ভাই। ইসলাম গ্রহণকারীদের একদম প্রথম দিককার একজন নিপীড়িত সাহাবী। তিনি দু'বার হাবশায় হিজরত করেন। দ্বিতীয়বার হিজরতের সময় পরিবারের সব সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করেন। মদীনায় হিজরতের পর তাঁর বাড়িঘরে আবু জেহেলচক্র ব্যাপক লুটপাট চালায়। পীড়াদায়ক এ ঘটনাটি নবীজীকে তিনি অবহিত করলে নবীজী আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে জান্নাতে একটি বাড়ি দেয়ার সুসংবাদ শোনান। তিনি খুশি হয়ে যান।

বদরের যুদ্ধেও তিনি ব্যাপক বীরত্ব ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তবে বদরের যুদ্ধের আগে আগে ছোট্ট একটি অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে আমীর বানিয়ে পাঠান। কোনো একটি ইসলামী সেনাবাহিনীর আমীর হওয়ার প্রথম সৌভাগ্য এভাবেই তিনি লাভ করেন। এছাড়াও এ অভিযানে পরামর্শের ভিত্তিতে তাঁর গৃহীত আরো কিছু সিদ্ধান্ত পরবর্তী সময়ে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে সত্যায়িত হয়। জাহেলি যুগে প্রচলিত নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ সংঘটন এবং যুদ্ধ বিজয়ের পর অর্জিত সম্পদের মধ্য থেকে এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ রাসূলের কাছে জমা দিয়ে বাকিটুকু যোদ্ধাদের মাঝে গনীমত হিসেবে সমভাবে বণ্টনের যে নীতি তিনি বাস্তবায়িত করেন, প্রথম দিকে এর কোনো কোনোটির কারণে কারো কারো কাছে তিনি সমালোচিত হলেও অনতিদেরিতে নাযিলকৃত কুরআনের বিধান-অনুযায়ী তাঁর সিদ্ধান্তই সঠিক সাব্যস্ত হয়। তখন ব্যাপক প্রশংসা ও অভিনন্দন পান তিনি নবীজীসহ সর্বস্তরের সাহাবীগণের পক্ষ থেকে।

আসলে নিষিদ্ধ সময়ে আক্রমণ এবং জিহাদ থেকে প্রাপ্ত গনীমত তাঁর কোনো প্রধান উদ্দেশ্য বা উপলক্ষ্য ছিল না। তিনি কেবল ইসলামের শত্রুদের দুর্বল করে দেয়া এবং ইসলামের মুজাহিদ সাহাবীদের ত্যাগের মূল্যায়ন ও মর্যাদা দানের জন্য পরামর্শের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করেছিলেন।

তিন

হিজরী তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসে উহুদ প্রান্তরে শুরু হলো মরণপণ সংগ্রাম। রণাঙ্গনের প্রত্যেক সাহাবী-ই বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মক্কার কাফের শক্তি মরিয়া, মহা রণপ্রস্তুতি নিয়ে তারা ছিল বিপুল অস্ত্রে সজ্জিত। অপরদিকে একটি গিরি উপত্যকায় পাহারার বিষয়ে ভুল বুঝাবুঝিকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া বিপর্যয়ে মুসলিম যোদ্ধাদের ওপর নেমে আসে

চরম ও মারাত্মক বিপর্যয়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন বিপন্ন হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর দুটি পবিত্র দাঁতও শহীদ হয়ে যায়।

এই উহুদের যুদ্ধেই মর্যাদাবান কয়েকজন সাহাবীর মর্মন্তুদ শাহাদাতের ঘটনা ঘটে। এ যুদ্ধের আগের দিনই বিস্ময়কর দু'আটি করেছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এমন তীব্র আক্রমণ তিনি চালালেন যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর তরবারিটি ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেলো। তাঁর এ অবস্থা দেখে নবীজী তাঁকে একটি খেজুরের শাখা বা ডাল দিলেন। তীর-বর্ষা আর তরবারির তীব্র ও মুহুর্মুহু যুদ্ধের ঝাঞ্ঝামুখর সময়ে একদিক থেকে এই খেজুর শাখার হয়তো কোনো মূল্যই ছিল না; কিন্তু নবীজীর হাতে দেয়ায় এবং শাহাদাতপিয়াসী হৃদয়ের তীব্র আকুতির কারণে এই খেজুর শাখাই কাজ করে দৃঢ় এক যুদ্ধাস্ত্রের। দীর্ঘ সময় তিনি এই গাছের ডালটি দিয়েই লড়ে যেতে থাকেন বীর বিক্রমে, নিঃশংক চিত্তে, নিজেকে উজাড় করে দিয়ে।

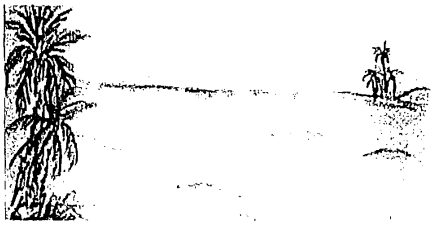
এক পর্যায়ে এক কাফেরের তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে তিনি লুটিয়ে পড়েন। শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন ইসলামী সেনাবাহিনীর প্রথম আমীর। তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর লাশ মাটিতে নিঃসাড় ও অধরা হয়ে পড়ে থাকে না। কাফেররা আক্রোশ মিটায় তাঁর উপর। তাঁর লাশের বিকৃতি সাধন করে। তাঁর নাক-কান কেটে সুতায় মালা গাঁথে। কাফেরদের পক্ষ থেকে কৃত এই বীভৎসতার দৃশ্যটি দেখে আগের দিন তাঁরই সঙ্গে দু'আর জন্য হাত-ওঠানো সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস বলে ওঠেন, 'আল্লাহর কসম! আবদুল্লাহর দু'আ কবুল হয়ে গেছে। তাঁর দু'আ আমার দু'আর চেয়ে উত্তম ছিল।'

চার

আল্লাহর পথে নিবেদিত এই মহাপ্রাণ সাহাবীর জীবনে আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসাই ছিল প্রধান। তাঁর এই অমর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

আত্মত্যাগের কারণে ইসলামের ইতিহাসে তিনি 'আল্লাহর পথে কানকাটা' উপাধি লাভ করেছিলেন। দ্বীনের জন্য রক্তলাল আস্তিনে এমনভাবে সর্বস্ব সমর্পণের ইতিহাস দুনিয়ায় বার বার খুঁজে পাওয়া যাবে না। ⊙

[তথ্যসূত্র :
আল ইসাবা, নং- ৪৫৮৬]



ধুলিধুসর রক্তাক্ত চেহারা তাঁর

উহুদ যুদ্ধটি ছিল চাপিয়ে দেয়া। বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নিতে দীর্ঘ ও ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে মক্কার কাফেররা বিশাল সেনাদল নিয়ে মদীনার দিকে এগিয়ে আসে– বিনা নোটিশে বিনা খবরে। কিন্তু এ খবর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সময়মতো চলে আসে।

কম সময়ের মধ্যেই মুসলিম যোদ্ধাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। মদীনায় ছিলেন মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের দু'টি বৈশিষ্ট্যগত শ্রেণী। এমনিতে সবাই এক। আল্লাহনির্ভরতা, রাসূলপ্রেম, দ্বীনের উপর অবিচলতায় শ্রেণীগত কোনো পার্থক্য তাঁদের মাঝে ছিল না। কেবল যারা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন তাদের বলা হতো মুহাজির। আর যে সব ইসলাম গ্রহণকারী মদীনাবাসী মক্কার মুহাজিরদের আশ্রয় দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন তারা হলেন আনসার। স্বাভাবিক ধারা ও সঙ্গত কারণেই মুহাজিরদের বড় একটি অংশই ছিলেন ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে অগ্রগামী। তারা ছিলেন পূর্ব থেকেই কষ্টসহিষ্ণুতা ও নিগ্রহের সঙ্গে অভ্যস্ত, পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষিতও। কঠিন ও কঠোর কোনো বিষয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কষ্টসহিষ্ণুতা, ত্যাগ-তিতিক্ষায় পরীক্ষিতজনদের খুঁজতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) তাই মুহাজিরদের মধ্য থেকে কাউকে খুঁজে নিতেন, বেছে নিতেন। এর সুফলও পাওয়া যেতো বিরাট।

যুদ্ধ শুরুর আগে রাসূলে আকরাম (সা.) মুসলিম সৈনিকদের সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। গভীরভাবে কিছু একটা খুঁজে দেখছেন। গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছেন। এরপর তিনি সমবেত মুজাহিদদের সারি থেকে একজনকে ডাকলেন এবং আজকের জিহাদের ঝাণ্ডাটি তাঁর হাতেই তুলে দিলেন। তিনি হলেন উহুদ যুদ্ধে ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী হযরত মুসআব (রা.)।

দুই

মুসআব; মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.)। ইসলাম যখন প্রকাশ্যে প্রচার হতো না, সাফা পাহাড়ের পাদদেশে হযরত আরকামের বাড়িকে কেন্দ্র করে ইসলামের শিক্ষাদীক্ষা ও প্রচার চলতো। ইসলাম যখন গ্রহণ করেছে মুষ্টিমেয় সত্যপ্রাণ কিছু মানুষ মুসআব সে সময়েই ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তিনি এক যুবক। মুসআব ছিলেন এক বিত্তবান পরিবারের সুন্দর চেহারার রুচিশীল তরুণ। সবচেয়ে দামী পোশাক আর সবচেয়ে উন্নত সুগন্ধি ব্যবহার করাই তাঁর অভ্যাস ছিল। রুচি, বিত্ত ও আভিজাত্যের কারণে মক্কার তরুণদের মধ্যে তার কদর ছিল অনন্য মাত্রার। ইসলাম গ্রহণের পর মুসআবের উপর সমাজ ও গোত্রের পাশাপাশি সর্বাধিক বাধা ও অত্যাচার আসে তাঁর নিজ পরিবারের পক্ষ থেকেই; বিশেষত তাঁর মায়ের পক্ষ থেকে। তাঁর মায়ের উদ্যোগেই ইসলাম গ্রহণের পর পর তাঁকে কিছুদিন বন্ধ ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়। পাহারা বসিয়ে বন্দি জীবনে বাধ্য করা হয়। সেবার তিনি পালিয়ে হাবশায় হিজরত করে চলে যান। কিছুকাল পর আবার যখন মক্কায় তিনি ফিরে আসেন তখন তাঁর মা আবারো তাঁকে আটকে রাখার উদ্যোগ নিতে চান। কিন্তু ইসলাম পালনের ব্যাপারে মায়ের বিধি-নিষেধকে চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ দিয়ে তিনি পথে নেমে আসেন।

বিত্তবান পরিবারের সৌখিন যুবকের গায়ে তালি দেয়া পোশাক আর দারিদ্র্যের করুণ চিহ্ন ফুটে ওঠে তখন থেকে। ইসলামের সঙ্গে নিজের

হৃদয়-মন ও জীবনকে জড়িয়ে ফেলার পর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় আরবের এই সৌখিন বিত্তবান যুবক রাতারাতি হত দরিদ্র এক মানুষের জীবনে প্রবেশ করেন। মক্কায় এসে মদীনার কিছু লোক নবীজীর হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণের পর হযরত মুসআবকে পাঠানো হয় মদীনায়। কুরআনের শিক্ষক হিসেবে, দ্বীনের শিক্ষক হিসেবে। মদীনায় মক্কার মুহাজিরদের মধ্যে তাই তিনি ছিলেন বিশেষভাবে অগ্রগামী। গভীর ঈমান, অসীম তাওয়াক্কুল, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা আর সুকৌশলে মদীনার যমীনে ইসলামের শিক্ষা প্রচারে বিরাট ভূমিকা রাখেন তিনি। মদীনার মানুষের রুচি, চিন্তা ও মেজাজের সঙ্গে তাঁর অবগতি ও অভিজ্ঞতা অন্য মুহাজিরদের তুলনায় অর্জিত হয়েছিলো আগে থেকেই। মদীনার মানুষের সঙ্গে তিনি মিশে গিয়েছিলেন। এজন্য রাসূলে আকরাম (সা.) -এর সঙ্গে যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন অপর মুহাজির সাহাবীদের দল তখন তাঁরা মদীনার যমীনকে ইসলামের জন্য প্রস্তুত অবস্থাতেই পেয়েছিলেন। এর পেছনে হযরত মুসআবের অবদান ছিল বিরাট।

তিন

উহুদ প্রান্তর যখন পুরো দস্তর উত্তপ্ত হয়ে উঠলো, তরবারির ঝনৎকারে চারদিক প্রকম্পিত হলো, তখনই ঘটলো এক দুর্ঘটনা। উপত্যকার পাহারাদারিতে নিযুক্ত সাহাবীগণ রাসূলের নির্দেশ ভুলে গিয়ে কাফেরদের পিছু ধাওয়া করলেন, স্থান ত্যাগ করলেন। এ ফাঁকেই কাফেরবাহিনী পেছন দিক থেকে আক্রমণ করলো। মুসলমানদের বিন্যাস বিপর্যস্ত হয়ে গেলো। এ অবস্থাতেই কাফেররা সব কৌশল ও শক্তি ব্যয় করে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) -কে ঘিরে ফেললো। নবীজীকে হত্যা করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক।

মুসআব এ ভয়াবহ দৃশ্যটি কাছ থেকে দেখে ব্যাকুল হয়ে গেলেন। কিন্তু স্থির মাথায় কিছু কৌশলী ও প্রত্যয়ী আচরণ শুরু করলেন।

ঝাণ্ডাটি উঁচু করে ধরলেন। যতদূর সম্ভব গলা ফাটিয়ে গগণবিদারী হুঙ্কার এবং তাকবীরধ্বনি দিতে লাগলেন। প্রয়োজনের চেয়েও অধিক লাফ-ঝাঁপ দিয়ে কাফেরদের দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট করলেন। এ সব কিছুই ছিল কাফেরদের দৃষ্টি সরিয়ে নবীজীকে হেফাজতের উদ্দেশ্যে করা কিছু আচরণ। এভাবেই তিনি এক হাতে ঝাণ্ডা বহন করছিলেন, অপর হাতে তরবারি চালিয়ে যাচ্ছিলেন আর হুঙ্কার ও তাকবীরধ্বনি দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছুতে কাফেরদের সামনে তিনি বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। এ সময়ই এক কাফের ঘোড়সওয়ার এসে তারবারির এক আঘাতে তাঁর ডান হাতটি কেটে ফেললো। তিনি বাঁ হাতে ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরলেন। এবার বা হাতেও তরবারির কোপ পড়লো। বাঁ হাতটাও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। তিনি কাটা দু'হাতের দু'বাহু দিয়ে ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরে রাখলেন। আক্রমণ এলো এবার বর্ষার। তাঁর বুক বর্ষাবিদ্ধ হলো। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আরবের সবত্যাগী যুবক মুসআব আল্লাহর পথে উৎসর্গিত হলেন। শাহাদাতের লাল সমুদ্রে তাঁর পুণ্যের জাহাজ বিজয়ীর ভঙ্গিতে ভেসে চললো।

চার

যুদ্ধের ঝড় যখন থেমে গেছে তখন শহীদ সাহাবীদের লাশ কাফন-দাফনের পর্ব শুরু হলো। রণাঙ্গনে হযরত মুসআবের লাশটি পাওয়া গেলো। তাঁর গোটা চেহারাজুড়ে লাল রক্ত আর ধুলোবালি কাদার মতো লেগে আছে। রক্তাক্ত, ধুলিধুসরিত শায়িত শহীদ মুসআবের সামনে দাঁড়িয়ে নবীজী শক্ত হয়ে থাকতে পারলেন না। অঝোরে কেঁদে ফেললেন।

উহুদ যুদ্ধে শহীদ হওয়া সত্তরজন সাহাবীর সবার সম্পর্কে তখনো জানাজানি হয়নি। যুদ্ধ শেষ। কিন্তু রণাঙ্গনে একে একে শহীদদের পাওয়া যাচ্ছে আর তাঁদের কাফন-দাফনের প্রস্তুতি চলছে। মুসআবের স্ত্রী হামনা তাঁর ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) -এর

শাহাদাতের খবর হয়তো তখন পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও তার স্বামীর শাহাদাতের খবর জানতে পারেননি, যদিও তিনি উহুদ রণাঙ্গনে সাহায্যকারী হিসেবে আরো ক'জন নারী সাহাবীর সঙ্গেই উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধ শেষ হলে হামনা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে উপস্থিত হন। হামনাকে দেখে রাসূলের মন আরো বিষন্ন হয়ে যায়। রাসূল (সা.) তাঁকে বলেন, 'হামনা! হিসাব কর।' 'হামনা বলেন' 'কাকে?' রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তোমার মামা হামযাকে।' হমনা বলেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন। তাঁর উপর দয়া ও অনুগ্রহ নাযিল করুন এবং তাঁকে জান্নাত দিন।'

রাসূল (সা.) এরপর বললেন, 'আরেকজনকে গণনা কর?' হামনা আবারো জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে?' রাসূলে আকরাম (সা.) বেদনা-ভারাক্রান্ত স্বরে বললেন, 'তোমার স্বামী মুসআব ইবনে উমায়েরকে।' একথা শোনামাত্রই হামনা উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠলেন। বলতে লাগলেন, 'হায়! আমার দুঃখ।' সদ্যবিধবা হামনার বুকফাটা আর্তনাদে উহুদের বাতাস আরো ভারী হয়ে উঠলো। পরিবেশে নেমে এলো বেদনায় ছেয়ে যাওয়া এক হাহাকার।

তাঁর কাফনের সময়ও এক প্রস্থ চাদর ছাড়া আর কোনো কাপড় পাওয়া গেলো না। মাথা ঢাকলে পা, পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যায়। রাসূলে আকরাম (সা.) -এর নির্দেশে সাহাবীগণ মুসআব (রা.)-এর মাথার দিকটি কাপড় দিয়ে ঢেকে তাঁর পা ঢেকে দিলেন ঘাস দিয়ে। মুসআবের কাফনের অপূর্ণাঙ্গ কাপড়টির দিকে তাকিয়ে দয়ার নবী মুসআবকে খেতাব করে স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'আমি তোমাকে মক্কায় দেখেছি। সেখানে তোমার চেয়ে সুন্দর চাদর আর সুন্দর জুলফি কারো ছিল না। আর আজ তুমি এখানে ধুলিমলিন অবস্থায় এক চাদরে পড়ে আছো।'

রাসূল প্রত্যয়ের সঙ্গে আবারো ঘোষণা করলেন, 'আল্লাহর রাসূল সাক্ষ্য দিচ্ছে, কিয়ামতের দিন তোমরা প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে সাক্ষী

দানকারী হবে।' তিনি সঙ্গীদের উদ্দেশ করে আরো বললেন, 'হে লোকেরা! তোমরা তাদের যিয়ারত কর, তাদের কাছে এসো, তাদেরকে সালাম পেশ করো। যাঁর হাতে তোমার জীবন সেই সত্তার কসম! কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে যারা সালাম দেবে তারা তাদের প্রত্যেককেই সালামের উত্তর দেবে।'

হযরত মুসআব (রা.) -এর শাহাদাতের এই বেদনাবিধুর হৃদয়স্পর্শী চিত্র দেখে আরেক নির্যাতিত সাহাবী হযরত খাব্বার ইবনুল আরাত (রা.) বলেছেন, আল্লাহর পথে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমরা হিজরত করেছিলাম। আমাদের এ হিজরতের প্রতিদান আল্লাহর হাতে। আমাদের মধ্যে যারা এর কোনো প্রতিদান না নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.) ছিলেন তাঁদেরই একজন।

উহুদ প্রান্তরে ধুলিধুসরিত রক্তাক্ত মুসআবের দিকে তাকিয়ে বহু সাহাবীই চোখের পানি সংবরণ করতে পারেননি। এর কারণ, কেবল মুসআবের শাহাদাতের দৃশ্যটি ছিল না; মক্কায় যারা মুসআবের সৌখিন ও সুখী জীবনের জৌলুস দেখেছিলেন, দ্বীনের জন্য তিলে তিলে তাঁর ত্যাগ, কষ্ট, তাঁর গায়ে দারিদ্র্যের চিহ্ন দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত এই খুন-ধুলির মধ্যে তাঁকে নিথর দেখে তাঁরা তো কুরবানী আর উৎসর্গেরই একটি জীবন্ত ইতিহাস প্রত্যক্ষ করলেন। বিচিত্র রং, বর্ণ আর দৃশ্যের মাঝে ধুলি-ধুসরিত এই লাল আস্তিনকে পৃথিবীর ইতিহাস কি কোনো দিন ভুলে যেতে পারবে? ⊙

[তথ্যসূত্র : আল ইসাবা, পৃষ্ঠা- ১৮১৮;
ইবনে হিশাম, ২ : ৭৩-৭৪]

হঠাৎ যুদ্ধ
হঠাৎ শহীদ



পেশায় তিনি কী ছিলেন? একজন রাখাল অথবা কৃষক। অতি সাধারণ ও অনুল্লেখযোগ্য কোনো পেশার অধিকারী ছিলেন। পেশাগত বৈশিষ্ট্য বা আর্থিক মর্যাদার কোনো বিষয় তাঁর মাঝে ছিল না।

মদীনার এক গ্রামে থাকেন। সরল সাদাসিধা জীবন তাঁর। তেমন পরিচিত কেউ তিনি নন। সবাই তাঁকে ভালো করে চিনতেনও না আগে। বড় বড় কাজে অন্যদের যেমন ডাক পড়ে, তেমনভাবে তাঁকে খোঁজ করাও হতো না।

দিনের বেলায় তিনি ছাগল চরান। সামান্য ফসলের জমি চাষবাস করেন। দূরের পাহাড়ি ঢালে, মাঠে-প্রান্তরে যাতায়াত করেন। তাঁর সাথে থাকে একপাল ছাগল। কখনো কখনো সেই ছাগলের রশি হাতে নিয়েই তিনি দিন পার করে দেন। কারো সাতে-পাঁচে থাকেন না। হৈ-হট্টগোল, ঝামেলা থেকে দূরে দূরেই থাকেন। অবশ্য দ্বীনের হুকুম মেনে চলার ব্যাপারে কোনো গাফলতি তাঁর হতো না। অন্তরে বিরাজ করতো সব সময় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা, গভীর ঈমান এবং ঈমানী মর্যাদাবোধ।

তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী। তাঁর নাম ওহাব ইবনে কাবিস। ওহাব ইবনে কাবিস (রা.) এভাবেই তাঁর সরল জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছিলেন।

দুই

উহুদ যুদ্ধের দিন।

ভাতিজাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছেন ওহাব (রা.)। তাঁর সঙ্গে একপাল ছাগল। একটি রশিতে ছাগলগুলো বাঁধা। মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন তিনি। মদীনা শহরের কাছাকাছি একটি মাঠে ছাগলগুলো চরাবেন, এটাই তাঁর ইচ্ছা। উহুদ প্রান্তরে যে যুদ্ধ হচ্ছে, এ সম্পর্কে তিনি তখনও জানেন না।

ছাগলের পাল নিয়ে ওহাব (রা.) যখন মদীনায় এসে পৌঁছুলেন, তখন মদীনা শহর থমথমে। লোকজন কম। পথ-ঘাট ফাঁকা। তাঁর মনে সন্দেহ জাগলো, সবাই মিলে কোথাও চলে গেলেন না কি? রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও কি কোথাও চলে গেলেন? ওহাব ইবনে কাবিস (রা.) পথে একজনকে পেয়ে গেলেন। মনের ভাবনা ও দুশ্চিন্তার কথাটা তাকে বলেই ফেললেন– 'ভাই! রাসূলুল্লাহ (সা.) এখন কোথায় বলতে পারেন?' লোকটি জবাব দিলেন, 'সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলে করীম (সা.) উহুদ প্রান্তরে গিয়েছেন। সেখানে মুশরিকদের সাথে আজ মুসলমানদের যুদ্ধ হচ্ছে।' ওহাব (রা.) আর দেরি করতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধে চলে গেছেন আর তিনি মদীনায় ছাগল চরাবেন, এটা তিনি ভাবতেই পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই উহুদ প্রান্তরের দিকে রওয়ানা দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওহাব (রা.) উহুদ প্রান্তরে হাজির হলেন। দেখলেন হাজার খানেক সাহাবী কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাচ্ছেন। যুদ্ধের তখন এক কঠিন ও বিপর্যয়কর অবস্থা। মুসলমানদেরকে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ করে ফেলেছে, চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। ওহাব নিজে যুদ্ধপ্রান্তরে ঢুকে পড়লেন। দূরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। রাসূলের খুব কাছে পৌঁছে গেলেন তিনি। ঠিক সে মুহূর্তে একদল কাফের মুসলমানদেরকে আক্রমণ করতে করতে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর দিকে এগিয়ে এলো। কাফেরদের মতলব

ভয়ংকর। তারা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রাসূলের উপর আক্রমণ করতে চায়। মুসলমানদের কাউকে শহীদ করে দিয়ে আর কাউকে আহত করে কাফেররা দ্রুত এগিয়ে আসছে। কাফেরদের এভাবে এগিয়ে আসতে দেখে ওহাব (রা.) ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'যে ব্যক্তি এই কাফেরদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারবে, বেহেশ্‌তে সে আমার সাথী হবে।'

রাসূলের কথা শেষ হতেই ওহাব (রা.) যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। খোলা তলোয়ার হাতে আল্লাহ্‌র রাসূলের শত্রুদের ধাওয়া করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাফেরদের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। কাফেররা আরো দু'বার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দিকে এগিয়ে এসেছিল। সেই দু'বারও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হৃদয়টাকে উজাড় করে দিয়ে ওহাব (রা.) তাদের ধাওয়া করে সরিয়ে দিলেন। আল্লাহর রাসূল (সা.) ওহাব ইবনে কাবিসের এই সাহসী ভূমিকায় অত্যন্ত খুশি হলেন। ওহাব (রা.)-কে বেহেশ্‌তের সুসংবাদ শোনালেন।

বেহেশতের সুসংবাদ পেয়ে ওহাব (রা.) খুশিতে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। জীবনের সব পাওয়া তাঁর হয়ে গেছে। প্রাপ্তি ও আকাঙ্ক্ষার, জীবন ও জগতের আর কোনো কিছুরই জায়গা তাঁর অন্তরে নেই। জীবন-মৃত্যুর হিসাব নিকাশ সব ভুলে গেলেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যেই একেবারে সোজা শত্রুদের মাঝে গিয়ে ঢুকে পড়লেন। যুদ্ধ করতে লাগলেন। অসম সাহসী বীরের মতো যুদ্ধ করে বহু কাফেরকে ধরাশায়ী করে দিলেন। যুদ্ধ করতে করতে এক সময় ওহাব ইবনে কাবিস (রা.) নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেলো, রাখাল ওহাব এক মহান বীরের মতো শুয়ে আছেন রক্তের গালিচায়। সাহসী বীর ওহাব (রা.)-এর মাথার কাছে রাসূলে কারীম (সা.) এসে দাঁড়ালেন। কান্না মাখানো গলায় বললেন– 'ওহাব! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, আল্লাহও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।' ওহাব (রা.)-কে দাফন করলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)। দ্বীনের পথে এ বীর শহীদের মর্যাদা উপলব্ধি করলেন সব সাহাবী।

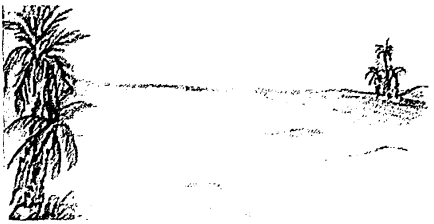
উহুদ যুদ্ধে শরিক সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, 'ওহাবের মতো এত বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমি কাউকে কোথাও দেখিনি।' হযরত উমর ফারূক (রা.) বলেন, 'কারো আমলের প্রতিই আমার এমন ঈর্ষা ও আকাঙ্ক্ষা জাগে না, যেমন জেগেছে ওহাবের আমলের ওপর। আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা, ওহাবের মতো আমল নিয়ে যদি আমি আল্লাহর দরবারে পৌঁছুতে পারতাম।'

আল্লাহর পথে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন ওহাব (রা.)। বেহেশতে তাঁর জায়গা করে নিলেন। এলেন, শুনলেন, দেখলেন আর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হঠাৎ করেই যেন সব হয়ে গেলো। দুনিয়ার চোখে অতি মামুলি পেশার অধিকারী একজন ওহাব অপার্থিব উত্তরণের সর্বোচ্চ সিঁড়িটি মুহূর্তেই টপকে গেলেন।

জিহাদের প্রকৃত ডাক অনুধাবন আর খাঁটি দিলে আত্মদানই হচ্ছে দ্বীনের পথে অমরত্ব অর্জনের বড় উপায়, বড় পথ। একেকজন সাহাবীর জীবনে এ পথটিই আরো উজ্জ্বল ও সমৃণ হয়ে উঠেছিল স্বয়ং রাসূলের সাহচর্যে। সাহাবী ওহাবের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল।

আল্লাহর পথে নিবেদিত বান্দাদের ইতিহাস এমনই হয়। ⊙

[তথ্যসূত্র : আল ইসাবা- নং- ৯১৭৪]



নকীব যোদ্ধা শহীদ

মদীনার খাযরাজ গোত্রের লোক। এ গোত্রের বনু হারিস শাখায় তাঁর জন্ম। হিজরতের আগেই মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তিনি তাঁদের একজন। তিনি প্রথম আকাবা কিংবা দ্বিতীয় আকাবায় শপথ গ্রহণ করেন। মদীনার ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত এই সাহাবী তৃতীয় আকাবায় আরো সত্তরোর্ধ্ব মদীনাবাসীর সঙ্গে মক্কায় যান। তৃতীয় আকাবায় তাঁকে এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)কে তাদের গোত্র– খাযরাজের বনু হারিসের নকীব বা দল নেতা বানিয়ে দেন হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তাঁর নাম সা'দ; সা'দ ইবনে রাবী।

সা'দ ইবনে রাবীর ইতিহাস ইসলামের জন্য ঘর, বন্ধন সম্পদ আর জীবন উজাড় করতে প্রস্তুত থাকার ইতিহাস, প্রাণ বিলিয়ে দেয়ার ইতিহাস। হিজরতের পর পর মক্কা থেকে হিজরত করে আসা এক সাহাবীকে তাঁর সঙ্গে ভাই সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দেয়ার পর সেই মুহাজির সাহাবীকে নিয়ে তিনি বাড়িতে আসেন। মক্কায় ঘরবাড়ি ছেড়ে আসা সাময়িক সময়ের দরিদ্র ও রিক্তহস্ত সাহাবীকে তিনি তাঁর আয়ত্তের সবকিছু থেকে অর্ধেক দিয়ে দেয়ার দিলখোলা প্রস্তাব করেন। তিনি তাঁর সম্পদ ও বাগানের অর্ধেক যেমন মুহাজির ভাইকে দিয়ে দিতে চান তেমনি তার দু'স্ত্রীর কোন একজনকে তালাক দিয়ে সে

ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন গড়ে দিতেও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই মহান উদারচিত্ত সম্মানিত মুহাজির সাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) সা'দের এ হৃদয়জাত প্রস্তাব ও বদান্যতার বিষয়টির জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সৌজন্যের সঙ্গে এ ধরনের কিছু গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান। তিনি কেবল তাঁর সাহায্যে ব্যবসার জন্য বাজারের পথ সন্ধান করেন। জীবিকার বিষয়টি এরপর তিনি ব্যবসার মাধ্যমেই সমাধা করেন।

কিন্তু হযরত সা'দ ইবনে রাবীর প্রস্তাবে তিনি অভিভূত হয়ে যান। কেবল অর্থকড়ি নয়, দ্বীনের জন্য মুহাজির ভাইয়ের স্বার্থে নিজের ঘর-সংসারেও বিধিসম্মতভাবে ত্যাগ ও অর্পণের প্রস্তুতির এ ঘটনাটি ইতিহাসের এক মহান অধ্যায় হিসেবেই স্থান করে নেয়।

দুই

কেবল সহানুভূতি ও ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বই নয়, সা'দের জীবনে উজ্জ্বল হয়ে আছে ইসলামের জন্য সংগ্রাম ও জিহাদের আত্মনিবেদনের ইতিহাস। ইসলামের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ– বদরের যুদ্ধে তিনি বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ যুদ্ধে মক্কার এক কাফের সৈনিক তাঁর হাতে মারা পড়ে।

উহুদ যুদ্ধের আগে মক্কার কাফেরদের রণপ্রস্তুতির খবর বিশেষ সূত্রে পাওয়ার পর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার আনসারদের মধ্য থেকে যে দু'জনকে গোপন এ খবরটি প্রথম জানান, তাদের দ্বিতীয় জনই হলেন সা'দ ইবনে রাবী।

এরপর যখন উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন সা'দের বীরত্ব ও সাহসিকতা, তাঁর আত্মদান ও ত্যাগ হৃদয়স্পর্শী ইতিহাসের একটি পাঠ অনাগত প্রজন্মের জন্য রেখে যায়। যুদ্ধের ময়দানে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে তিনি লড়তে থাকেন। উহুদ যুদ্ধে হঠাৎ সৃষ্ট বিশৃঙ্খল অবস্থার কোনো প্রভাব তাঁকে দুর্বলচিত্ত করতে সক্ষম হয়নি। লড়াকু

অবস্থায় একদল কাফের শত্রুসেনার সংঘবদ্ধ আক্রমণ ও আঘাতে তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্তে মুমূর্ষু অবস্থায় এক যোদ্ধা সাহাবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়েছেন কি? তুকি কি কিছু জান?' নিশ্চিত অন্তিম সময়েও দ্বীনের জন্য নিখাদ অন্তরে নিবেদিত সা'দ নির্বিকার ও প্রশান্ত চিত্তে বলেন, 'তিনি নিহত হলেও আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর তো মৃত্যু নেই। তুমি তোমার দ্বীনের পক্ষে জিহাদ করে যাও। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হলেও তিনি তো তাঁর রবের পয়গাম এবং রবের পক্ষ থেকে দেয়া শরীয়ত পুরোপুরি পৌঁছে দিয়ে গেছেন।'

তিন

উহুদ যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ময়দান জুড়ে শহীদ সাহাবীদের লাশ খুঁজে খুঁজে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা চলছিল। হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) নিজে রক্তাক্ত ও মারাত্মক আহত হওয়া সত্ত্বেও খুঁজে খুঁজে এনে প্রত্যেক সাহাবীর কাফন-দাফনের তদারকি করছিলেন। সা'দ ইবনে রাবীকে না দেখে রাসূলে করীম (সা.) একজনকে খোঁজ নিতে পাঠালেন। খোঁজ নিতে যিনি গেলেন তিনি ময়দানে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা লাশগুলোর মধ্যে সা'দকে খুঁজছিলেন। মাঝে মাঝে সা'দের নাম ধরে ডাকও দিচ্ছিলেন। কিন্তু কোনো সাড়াই পেলেন না। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন বলে আবারো চিৎকার দেয়া হলো, তখন সা'দ অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলেন। তাঁর জবাবের ধ্বনি লক্ষ করে দেখা গেলো, তিনি শহীদদের মাঝেই মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। খোঁজ নিতে আসা সাহাবীকে সা'দ ক্ষীণ ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)কে আমার সালাম দেবেন। তাঁকে বলবেন, আমাকে বারোটি আঘাত করা হয়েছে এবং আমিও আমার হত্যাকারীকে হত্যা করেছি।'

কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়, এরপর সা'দ সেই চূড়ান্ত অন্তিম সময়েও প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আনসারদের বলবেন, যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) নিহত হওয়ার মতো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটেই গিয়ে থাকে আর তোমাদের একজনও জীবিত ফিরে যাও, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর যোগ্য তোমরা থাকবে না। কারণ, আকাবার রাতে তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য জীবন উৎসর্গ করার শপথ নিয়েছিলে।' খোঁজ নিতে আসা সাহাবীর সামনেই এরপর হযরত সা'দ ইবনে রাবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শাহাদাতের রক্তিম বিছানায় তাঁর শেষ শয্যা রচিত হয়।

এক বর্ণনায় জানা যায়, খোঁজ নিতে যাওয়া সেই সাহাবী ছিলেন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)। তিনি যখন এসে হযরত সা'দের শাহাদাত এবং শাহাদাত পূর্বকালের অন্তিম কথাগুলো নবীজীকে শোনালেন, নবীজী অশ্রুভেজা চোখে বললেন, 'সা'দের উপর আল্লাহ তাআলা রহম করুন। জীবন-মরণ সর্বাবস্থায় সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে।' এরপর অন্য এক শহীদের সঙ্গে একই কবরে হযরত সা'দ ইবনে রাবীকে দাফন করা হয়।

চার

সা'দ ইবনে রাবী যখন শাহাদত বরণ করেন তখন তাঁর ছিল দুই শিশু কন্যা। তাঁর স্ত্রী ছিলেন গর্ভবতী। সা'দের ভাই তাঁর সব সম্পত্তি নিজের করে নিয়েছিলেন। সা'দজায়া রাসূলের দরবারে এসে তাদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত সংকট এবং অসহায়ত্বের কথা জানালে তিনি এ সংকটের সমাধানে মনোযোগ দেন। সা'দের দুই কন্যাকে সারাজীবন পৃষ্ঠপোষকতা ও স্নেহ দিয়ে যান। উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর সে অনুযায়ী সমস্যাটির সমাধানও করে দেয়া হয়।

পাঁচ

এ ঘটনার প্রায় সাত-আট বছর পরের ঘটনা। একদিন দেখা গেলো, খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ছোট্ট একটি মেয়েকে আদর করে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছেন। তার মুখের লালা মুছে দিচ্ছেন। শিশুটিকে চুমু খাচ্ছেন। উপস্থিত এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'খলীফাতুল মুসলিমীন! মেয়েটি কে?' হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) জবাব দিলেন– 'মেয়েটি তোমার ও আমার চেয়ে উত্তম এক ব্যক্তির মেয়ে। সা'দ ইবনে রাবীর মেয়ে। আর সা'দ ইবনে রাবী ছিলেন আকাবার নকীব, বদরের যোদ্ধা ও উহুদের শহীদ।' ⊙

[তথ্যসূত্র : সহীহ বুখারী- ২০৪৮;
আল ইসাবা, নং- ৩১৫১]



পরোয়াহীন মৃত্যু-পথযাত্রী

সবাই যখন তাঁকে ঘিরে নিয়ে চললো বধ্যভূমির দিকে, তখনো তিনি প্রশান্ত, অসাধারণ ধীর-স্থির। চারপাশে তাঁর মৃত্যুকামী হাজার মানুষের পৈশাচিক উল্লাস, কিন্তু তিনি নির্বিকার। তাঁর হাতে-পায়ে বেড়ি বাঁধা। তাঁকে ঠেলে ঠেলে, হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নেয়া হচ্ছে। চলছে ঢোল-তবলার বাজনা আর এলোপাথাড়ি নৃত্য। মক্কায় উকবার বাড়ি থেকে ধরে 'তানঈম' উপত্যকায় এবং সে উপত্যকার মাঝে একটি গাছে লাগানো শূলির দিকে। তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, এই শূলিতে চড়িয়েই তাঁকে হত্যা করা হচ্ছে।

তাঁর মৃত্যুর জন্য তৈরী শূলিকাঠের সামনে যখন তাঁকে আনা হলো, তখন তাঁর মৃত্যুকামীদের বীভৎস মাতামাতির মধ্যেই এই অসহায় বন্দির মুখ থেকে দৃঢ় ও শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসলো, 'আমাকে শূলিতে চড়ানোর আগে যদি তোমরা অনুমতি দাও তাহলে দু' রাকাত নামায আদায় করতে চাই।' মক্কার প্রতিশোধ মত্ত লোকেরা এতে বাঁধা দিলো না। বন্দি মানুষটি পবিত্র কা'বার দিকে মুখ করে বিগলিত হৃদয় নিয়ে অত্যন্ত স্থির ভঙ্গিতে দু'রাকাত নামায পড়লেন। নামায শেষে তাঁর মৃত্যুর উৎসবে আসা কুরাইশ সর্দারদের দিকে ফিরে প্রত্যয় ঝরা কণ্ঠে বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোমরা যদি মনে না করতে যে, আমি মৃত্যুভয়ে নামায দীর্ঘ করছি তাহলে এ নামায আরও দীর্ঘ করতাম।' এরপর তাঁকে শূলির দিকে এগিয়ে নেয়া হলো।

দুই

কে এই অসহায় বন্দি বিশ্বাসী মানুষ?

তিনি মদীনার আউস গোত্রের সন্তান ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় এক সাহাবী। হযরত খুবাইব ইবনে আদী (রা.)।

নবীজীর হিজরতের আগেই এই আনসারী সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের প্রচার প্রসারে ও সেবায় নিজেকে নিমগ্ন করে দেন। সঙ্গত কারণেই বদরের যুদ্ধে তাঁর বীরোচিত অংশগ্রহণের ঘটনা ঘটে। বদরের যুদ্ধে প্রধানত মুজাহিদদের মালামাল হেফাযতের দায়িত্বে থাকলেও যুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি পুরোদস্তর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং মক্কার পৌত্তলিক নেতা হারিস ইবনে নওফলকে হত্যা করেন। কারো কারো বর্ণনায় উহুদ যুদ্ধেও তিনি বীর মুজাহিদের ভূমিকা রাখেন।

ইসলাম গ্রহণ, ইসলামের জন্য তাঁর সার্বক্ষণিক সেবা এবং বদরের যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণের অধ্যায়টি তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীবন-অধ্যায় হলেও তাঁর জীবনের অন্তিম অধ্যায়টিই ইতিহাসের পাতায় দীর্ঘ ও দৃঢ়, উজ্জ্বল ও হৃদয়বিদারক এক অনাবিল অধ্যায়ের সৃষ্টি করে যায়।

হিজরী চতুর্থ সনের ঘটনা সেটি। এ হিসেবে ঘটনাটি উহুদ যুদ্ধের পরের। কারো কারো মতে বদরের যুদ্ধের কিছু দিন পরে এ ঘটনাটি ঘটে।

তিন

ঘটনার সূত্রপাত নিয়ে ইতিহাসের দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীগণের দশ সদস্যের একটি কাফেলাকে মদীনার আশে পাশে কাফের চক্রের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতার খোঁজ নিতে গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য পাঠান। তাঁরা যখন মদীনা থেকে বেশ দূরে 'হাদ্‌য়া' নামক স্থানে পৌঁছান তখন সেখানকার হুযাইল গোত্রের শাখা

'বনু লিহয়ান' তাঁদের অবস্থান টের পেয়ে যায় এবং তাদেরকে ঘিরে ফেলে। এই কাফেলারই একজন ছিলেন খুবাইব (রা.)। এরপর তারা তাঁকে মক্কার কাফেরদের কাছে বিক্রি করে দেয়।

অপর ঘটনাটি হচ্ছে, উহুদ যুদ্ধের পর মদীনা থেকে দূরবর্তী এক গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় রাসূলে আকরাম (সা.)-এর দরবারে এসে আব্দার জানিয়ে বলে, 'আমাদের ওখানে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাদেরকে কুরআন পাঠ ও ইসলামের বিধি-বিধান শেখানোর জন্য কিছু শিক্ষক সাহাবী আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে ভালো কাজ হবে।' মহানুভব রাসূল তাদের কথা বিশ্বাস করে ছয়জন সাহাবীর একটি কাফেলাকে প্রস্তুত করে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। আসলে এই লোকেরা ছিল প্রতারক। আগত প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কাফেলা যখন হুযাইল গোত্রের 'রাজী' কূপ বা জলাশয়ের কাছে পৌঁছালো তখনই ওরা সাহাবীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভাব করে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলো। এরপর হুযাইল গোত্রের লোকেরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এলো। সাহাবীদের ছোট্ট দলটিকে তারা ঘিরে ফেললো। সাহাবীগণ এ দৃশ্য দেখে যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে চাইলে তারা বললো, 'তোমাদের মেরে ফেলার ইচ্ছা আমাদের নেই। মক্কার কুরাইশদের হাতে তোমাদের তুলে দিয়ে আমরা তাদের কাছ থেকে কেবল কিছু সুবিধা নিতে চাই।' তাদের এ কথার পর পর্যায়ক্রমে লড়াই করে চার সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন।

থেকে যান দু'জন। হযরত খুবাইব ইবনে আদী (রা.), যায়েদ ইবনে দাসিনা (রা.)। এ দু'জনকে মক্কায় নিয়ে হুযাইল গোত্রের লোকেরা অতি উচুঁ মূল্যে বিক্রি করে দেয়। হযরত খুবাইবকে কিনে নেয় বদরের যুদ্ধে খুবাইবের হাতে নিহত হারিসের ছেলে উকবা। উদ্দেশ্য খুবাইবকে নির্মমভাবে হত্যা করে পিতৃহত্যার বদলা নেয়া। কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়, বদরের যুদ্ধে নিহত বেশ কিছু কাফের সর্দারদের সন্তানেরা একজোট হয়ে খুবাইবকে কিনে নেয়। কেউ কেউ বলেন, বদরে নিহত

হারিসের এক বৈপিত্রেয় ভাই তাঁকে কিনে উকবার হাতে তুলে দেয়। এরপর আয়োজন করে সাড়ম্বরে হত্যাপর্ব সমাধার জন্য উকবার বাড়িতে হযরত খুবাইব (রা.)-কে বন্দি করে রাখা হয়। এভাবে কেটে যায় কয়েক মাস।

চার

খুবাইব (রা.)-এর বন্দি জীবনটিও ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক জীবন। হাতে হাতকড়া পরিয়ে বাড়ির একটি আবদ্ধ ঘরে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়। তাঁর দিকে লক্ষ রাখার জন্য নিযুক্ত করা হয় একজন পাহারাদার। সে পাহারাদারের নাম ছিল মাওহাব। তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত যেদিন হয় তার আগেই তাঁর অনুরোধে মাওহাব এবং উকবার স্ত্রী বেদনাদায়ক সংবাদটি তাঁকে অবহিত করে। খুবাইবের পক্ষ থেকে এ ধরনের অনুরোধ তাদেরকে করার কারণ ছিল, আগে ভাগেই শাহাদাতের জন্য শারীরিক-মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

হত্যার সিদ্ধান্ত জানার পর খুবাইব নিজের প্রয়োজনীয় ক্ষৌরকাজ সারার জন্য উকবার স্ত্রীর– কারো কারো মতে যার নাম ছিল শাবিয়্যা– কাছ থেকে একটি ক্ষুর চেয়ে নেন। এ ক্ষৌরকাজ করা অবস্থায় উকবার একটি শিশু খেলাচ্ছলে দৌড়াতে দৌড়াতে খুবাইবের কাছে চলে আসে। খুবাইব শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে থাকেন। এ দৃশ্যটি হঠাৎ এসে দেখে ফেলে উকবার স্ত্রী। আঁতকে উঠে সে। কারণ প্রতিশোধস্পৃহা পূরণের জন্য যাকে হত্যার নিশ্চিত আয়োজন চলছে সে তো ধারালো অস্ত্রটি দিয়ে আগে ভাগেই তার শিশুটিকে হত্যা করে জেদ মেটাতে পারে। এরকম একটি আশংকা তার অন্তরে তীব্রভাবে জেগে ওঠে।

খুবাইব বুঝতে পারেন শিশুটির মায়ের মনের অবস্থা। তিনি হেসে ক্ষুরটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উকবার স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি ভেবেছো এই শিশুটিকে হত্যা করে আমি আমার হত্যার বদলা নেবো। এমন

কাজ আমাদের দিয়ে কখনো হতে পারে না। আমাদের চরিত্র এমন নয়।'

পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণের পর উকবার স্ত্রী জানান, আমাদের বাড়িতে বন্দি অবস্থায় খুবাইব কোত্থেকে যেন বৃহদাকারের আঙ্গুর পেতেন এবং খেতেন, আমি আড়াল থেকে দেখতাম। অথচ তখন মক্কায় আঙ্গুরের কোনো বাগান ছিল না, মৌসুম ছিল না। তিনি ছিলেন হাতকড়া পরা এক বন্দি। নিজ থেকেও সংগ্রহ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না এমন আঙ্গুর। এ নিশ্চয়ই ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া গায়েবী রিযিক।

পাঁচ

বহু মানুষের ভিড়। মক্কার কাফের সর্দাররা প্রথম সারির দর্শক। এর পেছনে অগণিত নারী-পুরুষ, শিশু। সবার ভেতরেই উল্লাস। বদরযুদ্ধে নিহত আপনজনদের প্রতিশোধ নেয়ার নৃশংস আয়োজনটি যেন তাদের জন্য তৃষ্ণা মিটাতে শীতল পানি সরবরাহের মতো একটি ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

খুবাইবকে শূলিতে চড়ানো হলো। আল্লাহর প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাস ও আস্থার কিংবদন্তিতুল্য প্রতীক খুবাইবের চোখ-মুখ তখনো ভাবলেশহীন। তিনি তখনো জীবিত। পাষণ্ড কাফেরের দলের মধ্য থেকে কেউ কেউ এগিয়ে গিয়ে জীবিত খুবাইবের দেহ থেকে একেকটি অঙ্গ কেটে আলাদা করে দিচ্ছে। এ অবস্থায় হযরত খুবাইব অত্যন্ত বিগলিত কণ্ঠে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন :

আমি যদি মুসলিম হিসেবে নিহত হই কোনো পরোয়া নেই,
আমার মৃত্যু আমার যে পাশ থেকেই আসুক।
এ মৃত্যু তো আল্লাহর সত্তার জন্যই।
তিনি চাইলে আমার দেহের প্রতিটি কর্তিত টুকরার ওপর
বরকত দিয়ে দিতে পারেন।

ফিনকি দিয়ে রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে খুবাইবের দেহ থেকে। যন্ত্রণায় আকাশ-পাতাল উলট-পালট হয়ে যাওয়ার কথা তাঁর। কিন্তু এ অবস্থাতেও যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার স্থানে মুহাম্মদকে আনা হোক আর তুমি মুক্তি পেয়ে যাও– তা কি তুমি পছন্দ করো?' রক্তের স্রোতের মধ্যে, কর্তিত-খণ্ডিত দেহ নিয়েই প্রত্যয় ও ক্ষোভের সঙ্গে খুবাইব (রা.) জবাব দিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি আমার পরিবারের লোকজনের মাঝে নিরাপদে বাস করার বিনিময়ে মুহাম্মদ (সা.) -এর গায়ে একটি কাঁটার আঁচড় লাগবে তাও আমি মেনে নিতে পারবো না।'

খুবাইবের মুখে প্রত্যয়ের এ ধ্বনি কাফেরদের মনের আক্রোশ আরও বাড়িয়ে দিল। চারদিক থেকে পৈশাচিক আওয়াজ উচ্চারিত হলো : ওকে হত্যা কর, হত্যা কর। এরপর শুরু হলো মুহুর্মুহু আঘাত। চারদিক থেকে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে। শেষ পর্যন্ত বর্ষা নিক্ষেপ করা হলো তাঁর দেহে। নিঃসঙ্গ, অসহায়, রক্তাক্ত, খণ্ডিত, বর্ষাবিদ্ধ, শূলিবিদ্ধ মহান সাহাবী খুবাইবের দেহটি নিথর হওয়ার আগে আকাশের দিকে মুখ তুলে তিনি আল্লাহর দরবারে শেষ ফরিয়াদ জানালেন :

'হে আল্লাহ! এদের সংখ্যা গুণে রাখুন। একে একে তাদের হত্যা করুন। তাদের কাউকে আপনি ছাড়বেন না।' শাহাদাতের আগেই খুবাইব তাঁর মুখ কেবলামুখি করে রেখেছিলেন। কাফেররা বহু চেষ্টা করেও সে মুখ কেবলার দিক থেকে সরাতে পারেনি।

ছয়

খুবাইবকে যেদিন শহীদ করা হয় অপর বন্দি যায়েদ ইবনে দাসিনাকেও সেদিনই শহীদ করা হয়। ওহীর মাধ্যমে হৃদয়বিদারক এ দুঃসংবাদটি নবীজী পেয়ে যান। ওই দিনই, ওই হত্যাকাণ্ড চলার সময়েই মদীনায় নবীজীর সঙ্গে থাকা সাহাবীগণ শুনেছেন অদৃশ্যের দিকে লক্ষ করে নবীজী বলছেন, 'তোমাদের দু'জনের প্রতি সালাম।'

এরপর শহীদের লাশের প্রতি কাফেরদের আরো অবমাননা থেকে খুবাইবের লাশ রক্ষা করা এবং দাফনের উদ্দেশ্যে নবীজী মদীনা থেকে সাহসী ও দক্ষ কয়েকজন সাহাবীর একটি দলকে পাঠালেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল গোপনে খুবাইবের লাশ নিয়ে যাওয়া। এ দলে হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.)-ও ছিলেন। তাঁরা 'তানঈমে' এসে দেখলেন, খুবাইবের খণ্ডিত লাশ শূলিতে ঝুলছে। আশে পাশে নেশাগ্রস্ত কিছু মানুষ ঢুলছে। সন্তর্পণে খুবাইবের লাশ শূলি থেকে নামিয়ে যুবায়ের তাঁর ঘোড়ার পিঠে উঠান। ঘোড়া যখন তিনি ছুটিয়ে দিতে যাবেন তখনই নেশাগ্রস্ত লোকগুলো জেগে যায় এবং তাঁদের ধাওয়া করে। যুবায়ের তখন লাশটি মাটিতে ফেলে দেন এবং অবাক হয়ে দেখেন মাটি সেই লাশটি গিলে ফেলেছে। মদীনা থেকে যাওয়া দলটি খালি হাতেই চলে আসে। কাফেররা বহু খোঁজাখুঁজি করেও হযরত খুবাইবের লাশের কোনো সন্ধান পায়নি।

আজও নয়, কালও নয়, দুনিয়ার কোনো মানুষই কোনো দিন জানতে পারেনি, খুবাইবের দাফন কোথায় হয়েছে!

সাত

শাহাদতের আগ মুহূর্তে খণ্ডিত, রক্তাক্ত দেহ নিয়ে আল্লাহর দরবারে খুবাইব (রা.) যে ফরিয়াদ জানিয়েছিলেন আল্লাহ তাআলা সে ফরিয়াদ পুরোপুরি কবুল করেছেন। খুবাইবকে আঘাত দিয়ে দিয়ে হত্যা করার ক্ষেত্রে যে কয় পাষণ্ড মূল ভূমিকা রেখেছিল তাদের কেউ রেহাই পায়নি। স্বাভাবিক মৃত্যু তাদের নসিব হয়নি। বছর কালের মধ্যেই তাদের প্রত্যেকেই নির্দয় হত্যার শিকার হয়েছে।

খুবাইবের শাহাদাতের করুণ দৃশ্যটি দেখেছেন এমন অনেকেই পরবর্তী সময় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁদেরই একজন ছিলেন সাঈদ ইবনে আমের জুমাহী (রা.)। দুনিয়াত্যাগী এই মহান সাহাবী হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে হিমসের গভর্নর ছিলেন। সে সময় তাঁর দারিদ্র্য, কৃচ্ছ্রতার পাশাপাশি মাঝে মাঝেই তার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার

একটি ঘটনা সবারই মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কোনো কারণে খলীফাতুল মুসলিমীন যখন তাঁকে অজ্ঞান হওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি হযরত খুবাইবের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি তো সে ঘটনার দর্শক ছিলাম। তাঁর দেহ থেকে গোশ্ত কেটে নেয়া হচ্ছিল, তাঁকে শূলিতে চড়িয়ে বর্ষা মারা হচ্ছিল। কিন্তু আমি তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাইনি। যদিও তখন আমি পৌত্তলিক ছিলাম, কিন্তু তাঁর সেই অসহায় শাহাদাতের দৃশ্যটি মনে হলেই আমার জ্ঞান ঠিক থাকে না। তাছাড়া আমার নিজেকেও অপরাধী মনে হতে থাকে; কেন আমি তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যাইনি সেদিন। আমার ভয় হয়, আমার এ অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তখনই আমার আর হুঁশ থাকে না।' এ উত্তর দিতে দিতেই তিনি আবার চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান।

আট

নিঃসঙ্গ শহীদ খুবাইব শূলির উপর রক্তাক্ত খণ্ডিত শরীরেই বীরের মতো জীবন দিলেন। কোনো উত্তেজনা বা অস্থিরতা নয়, তিলে তিলে তীব্র কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে তাঁকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হলেও তিনি ছিলেন পরম নিশ্চিন্ত। প্রশান্তির আবীর মাথায় নিয়েই যেন শূলিতে উঠেছেন। রক্তাক্ত শরীর থেকে গোশত খুবলে খুবলে নেয়া হচ্ছে এক দিকে। তিনি আল্লাহর প্রতি সমর্পিত কবিতা আবৃত্তি করে চলেছেন আরেক দিকে। কষ্টে কষ্টে তাঁকে যখন ঝাঁঝরা করে ফেলা হচ্ছিল, তখনও তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে এক আল্লাহর দরবারেই ফরিয়াদ জানিয়ে যাচ্ছিলেন।

খুবাইবের ইতিহাস খুবাইব রচনা করেছেন। সে ইতিহাসের পৃষ্ঠা লাল, সে ইতিহাসের পৃষ্ঠা অশ্রুভেজা। ⊙

[তথ্যসূত্র : সহীহ বুখারী- ৩০৪৫/৩৯৮৯; ইবনে হিশাম- ২/১৬৯-৭৪]



মৌমাছি পাহারা দিলো শহীদের লাশ

এক বর্ণনায় দশ সদস্যের গোয়েন্দাদলের নেতৃত্ব তাঁর হাতে দিয়ে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। আরেক বর্ণনায় আদল ও ক্বারাহ নামের দুটি গোত্রের কিছু লোক সদ্য ইসলাম গ্রহণকারীদের পবিত্র কুরআন শেখানোর জন্য ক'জন শিক্ষক সাহাবীকে তাদের সঙ্গে পাঠানোর আবেদন জানালে নবীজী তাঁকে-সহ মোট ছয়জনকে পাঠিয়েছিলেন। ঘটনার সূচনাপর্বে এই মতান্তর থাকলেও মূল ঘটনাটি নিয়ে কারো মাঝে দ্বিমত লক্ষ করা যায়নি।

যাঁর নাম হৃদয়বিদারক এই ঘটনাটির সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে তিনি হযরত আসেম ইবনে সাবেত (রা.)। আসেমসহ সাহাবীদের এ দলটি যখন হুযাইল গোত্রের 'রাজী' কূপের কাছাকাছি পৌঁছালেন তখন তাঁদেরকে দাওয়াত করে নিয়ে যাওয়া প্রতারক চক্রটি তাঁদের ঘিরে ফেললো এবং স্থানীয় গোত্রের লোকদেরও ডাকতে শুরু করলো। হুযাইল গোত্রের 'বনু লিহয়ান' শাখার লোকেরাও আক্রমণকারীদের পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে দাঁড়ালো।

দাওয়াতকারী কাফেলার হঠাৎ এই উল্টো-রূপ দেখে সরল শুভ্র হৃদয়ের অধিকারী সাহাবীগণ প্রথমে হোঁচট খেলেন, অবাক ও স্তম্ভিত হলেন; কিন্তু হাল ছাড়লেন না। শত্রুপক্ষের তুলনায় সংখ্যায় অতি নগণ্য হলেও তাঁরাও তরবারি কোষমুক্ত করে যুদ্ধ করার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। আক্রমণকারী বহু সশস্ত্র জনের বিরুদ্ধে নিরাপস ছয় সাহাবীর আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই– এটাই ছিল

শত্রুপক্ষের হিসাব। কিন্তু সাহাবীদের এই লড়াকু প্রস্তুতি ও ঘুরে দাঁড়ানোর চিত্রটি দেখে তারাও কিছুটা দমে গেলো।

প্রথমে আক্রমণকারীরা খোলা তরবারি নিয়ে ভয় দেখাতে চাইলেও পরে স্পষ্টতই শপথ করে বললো, 'তোমাদের হত্যা করে ফেলার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই। তোমাদের বন্দি করে মক্কাবাসীদের কাছে তুলে দিয়ে আমরা কেবল কিছু মুনাফা আদায় করে নিতে চাই। এরচেয়ে বেশি কিছু নয়। আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কোনো দরকার তোমাদের নেই। তোমরা আত্মসমর্পণ কর।' কিন্তু সাহাবীদের ছয় সদস্যের সেই কাফেলাটির মধ্য থেকে হযরত আসেমসহ তিনজন সঙ্গে সঙ্গেই দৃঢ়তার সঙ্গে এই প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমরা কোনো মুশরিকের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে পারি না।' নিরাপস যুদ্ধের জন্যই তাঁরা প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অপর পক্ষে প্রতারক ও আক্রমণকারী বহু সশস্ত্র ব্যক্তির বিপরীতে বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই, জেনেও তাঁরা তাঁদের প্রত্যয়ে অবিচল থাকলেন। ঈমানী মর্যাদাবোধ আর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা তাদের হৃদয়রাজ্যে প্রবল হয়ে ওঠলো। এরপর শুরু হলো অতি মুষ্টিমেয় ও অসহায় কিছু নিবেদিত-প্রাণের অসম এক প্রতিরোধ সংগ্রাম। হিজরতের ছত্রিশ মাস পর সফর মাসের ঘটনা এটি।

দুই

আসেম ইবনে সাবেত (রা.) মদীনার আউস গোত্রের সন্তান। নবীজীর মদীনা হিজরতের আগেই মদীনা-অধিবাসী সৌভাগ্যবান ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে তিনি ছিলেন একজন। বদর ও উহুদ যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে তিনি লড়াই করেন। বদর যুদ্ধের আগ মুহূর্তে জিজ্ঞাসার জবাবে আসেমের দেয়া রণকৌশল ও অস্ত্র প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কিত জবাব শুনে নবীজী সন্তোষ প্রকাশ করে সবাইকে সে পদ্ধতি অনুসরণ করতে বলেন। বদর যুদ্ধে কাফের শক্তির পক্ষে পর্যায়ক্রমে ঝাণ্ডা বহনকারী দুই ভাই মুসাফি ইবনে তালহা ও জুলুস ইবনে তালহাকে তিনি বীর বিক্রমে হত্যা করেন। বদর যুদ্ধে আসেম হত্যা করেন মক্কার

আরেক বর্বর ও উৎপীড়ক কাফেরসর্দার উকবা ইবনে আবি মুঈতকেও।

এক বছর পর আবার মক্কার কাফের শক্তি যুদ্ধের জন্য উহুদ প্রান্তরে এসে সমবেত হয়। তখনও মুসলিম বাহিনীতে আসেমের বীরত্ব ও দৃঢ়তা কিংবদন্তিতে পরিণত হয়। উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলিম শিবিরে কিছুটা বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা নেমে আসে এবং এক পর্যায়ে হযরত রাসূলে করীম (সা.)-কে টার্গেট করে কাফেররা ব্যূহ তৈরি করতে উদ্যোগী হয় তখন যে পনেরজন মুজাহিদ নবীজীর চারপাশে পাহাড়ের মতো মানবঢাল হয়ে দাঁড়ান এবং যুদ্ধ চালিয়ে যান, আসেম ছিলেন তাঁদেরই একজন। এই পনের জনের মধ্যে আটজন আবার মৃত্যুর জন্য রাসূলের কাছে বাইআত হন। আসেম তাঁদেরও একজন ছিলেন। আসেম এক দক্ষ তীর নিক্ষেপকারীর ভূমিকা পালন করেন সে যুদ্ধে। উহুদের যুদ্ধে আসেমের হাতে নিহত এক কাফের সৈন্যের মা জেদ ও আক্রোশের কারণে আসেমের মাথার খুলিতে মদ রেখে মদ পান করার শপথ করেছিল।

উহুদ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুশরিক বাহিনীর এক অকৃতজ্ঞ ও শপথ ভঙ্গকারী যোদ্ধাকে ধরে এনেও হত্যা করেন তিনি। বদর যুদ্ধে সেই মুশরিক যোদ্ধা বন্দি হওয়ার পর জীবনে আর কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না– এ শপথ করে ও মুচলেকা দিয়ে মুক্তি পেয়েছিল। এক বছর পর আবার সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয় উহুদ প্রান্তরে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সে ধরা পড়ে। এবারও সে ক্ষমা ও মুক্তি চায়। কিন্তু দ্বিতীয় বার আর তাকে ধোঁকা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি। নবীজীর নির্দেশে এক কোপে তাঁর দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেন আসেম।

ইসলামের পক্ষে বীরত্ব ও উৎসর্গের এ সব জীবনবাজি রাখা ঘটনার কারণে মক্কার কাফেরদের চোখে আসেম (রা.) ছিলেন প্রতিশোধের পাত্র, দু'চোখের বিষ। তারা সুযোগ পেলেই উল্লাস করে তাঁর মৃত্যুর আয়োজন করবে– এটা আসেমও বুঝতেন। আসেমসহ তাঁর সঙ্গীদেরকে যে বনু লিহয়ানের পাষণ্ডরা বন্দি করে মক্কার কাফেরদের

হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল সেটার পেছনে এ কারণটিও ছিল। আসেমের হাতে বদর-উহুদে নিহত মক্কার কোনো কোনো কাফেরের আত্মীয় আসেমের মাথার মূল্য ঘোষণা করেছিল একশ' উট। সে সময়ে এটি ছিল এক বিরাট মূল্যের পুরস্কার।

একই কারণে মুসলিম যোদ্ধাদের মাঝে তাঁর কদর ছিল ভিন্ন মাত্রার। সাহস, বিশ্বাস ও উৎসর্গের অতুলনীয় নজির স্থাপনকারী এ মহান সাহাবীকে তাই গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ ও অভিযানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। নবীজীর প্রতি আসেমের প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং পরীক্ষিত আসেমের প্রতি নবীজীর আস্থাই ছিল তৃতীয় হিজরীর সফর মাসে বের হওয়া কাফেলাটির নেতৃত্ব তাঁকে দেওয়ার কারণ। এর পরের ঘটনা তো ধোঁকা ও প্রতারণার, এর পরের ঘটনা তো নিরাপস যোদ্ধাদের অসম সাহসিকতার মধ্য দিয়ে দ্বীনের পথে আত্মবিসর্জনের।

তিন

সঙ্গীদেরসহ আসেম যখন শত্রুদের সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত হলেন তখন তিনি আত্মোৎসর্গের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে অস্ত্র চালানো শুরু করলেন। তাঁদেরকে ঘিরে রাখা কাফেররা কিছুটা দূরে সরে যাওয়ায় প্রথম দিকে আসেম (রা.) তীর নিক্ষেপ করে যাচ্ছিলেন। অপরদিক থেকেও আসছিল শত শত তীর। তাঁর হাতের তীর যখন ফুরিয়ে গেলো তখন তিনি বর্ষা চালাতে লাগলেন। এক সময় তাঁর বর্ষাটিও ভেঙ্গে গেলো। এবার শুরু করলেন তরবারি চালনা। তাঁদেরকে ঘিরে তৈরি করা কাফেরদের ব্যূহও পর্যায়ক্রমে সংকুচিত হয়ে এলো। দিন শেষে ঘনিয়ে এলো সন্ধ্যা।

হযরত আসেম (রা.) তাঁর অন্তিম সময়ে শাহাদাতের পর তাঁর দেহের হেফাযতের জন্য দু'আ করলেন। যুদ্ধে লিপ্ত আসেম আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানালেন, 'হে আল্লাহ! দিনের প্রথম ভাগে আমি তোমার দ্বীন রক্ষা করেছি। এখন দিনের শেষ ভাগে তুমি আমার দেহ রক্ষা করো।' দু'আ শেষে আবারো বীরত্বব্যাঞ্জক কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তুমুল

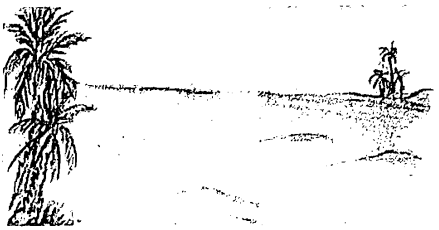
যুদ্ধে নিজেকে সমর্পণ করে ন তিনি। আঘাত আর পাল্টা আঘাতের মাঝে নিজেকে উজাড় করে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শাহাদাতের রক্তিম আস্তিনে তাঁর নিথর দেহটি ঢেকে গেলো।

চার

শাহাদাতের পর হযরত আসেমের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে মক্কায় নিয়ে বিক্রি করে দিয়ে মোটা পুরস্কার কামানোর লোভ বনু লিহয়ানের মুশরিকদের পেয়ে বসেছিল। তারা বার বার আসেমের লাশের দিকে এগিয়ে যেতে চাইলো। কোত্থেকে যে এক ঝাঁক মৌমাছি এসে তাদের দেহে তখন হুল ফুটাতে শুরু করে দেয়! তারা আবার পিছিয়ে আসে। শহীদ আসেমের লাশ পাহারা দিয়ে রাখে মৌমাছির ঝাঁক। মৌমাছির তাড়া খেয়ে কাফেরেরা বার বার পালিয়ে এসেও মনস্থ করে, দিন শেষ হোক, রাতের বেলায় গিয়ে সে লাশ নিয়ে আসবো। কিন্তু সূর্য ডুবার পর থেকেই শুরু হয় প্রচণ্ড বৃষ্টি। বৃষ্টির পানিতে গোটা 'রাজী' উপত্যকাটাই ভেসে যায়। থৈ থৈ পানি চারদিকে। পানির এ প্লাবনের মধ্যে লোভী, বর্বর কাফেররা এসে হযরত আসেমের লাশের আর কোনো সন্ধানই পায়নি। কোনো দিনই কেউ জানতে পারেনি, হযরত আসেম ইবনে সাবেত (রা.)-এর লাশটি কোথায় গিয়েছে, কোথায় দাফন হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা হযরত আসেম ইবনে সাবেতের প্রাণহীন দেহটিকে হেফাযত করেছেন এবং কাফেরদের আরো নীচুতা বর্বরতা ও অবমাননা থেকে রক্ষা করেছেন। ⊙

[তথ্যসূত্র : সহীহ বুখারী, ৩১৮৯; ইসাবা, নং- ৯৬৪; ইবনে হিশাম- ২/১৭১]



জানবায ইবনে খারাশা (রা.)

মদীনার খাযরাজ গোত্রের যুবক। ইসলাম গ্রহণ করেছেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের আগেই। ইসলামের জন্য নিবেদিত এ যুবক 'আবু দুজানা' নামেই মশহুর ছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূলের এক জানবায, বীর সাহাবী। ইসলামের জন্য, রাসূলের জন্য জীবনোৎসর্গের প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি চূড়ান্তভাবেই উত্তীর্ণ এক মানুষ। পিতা খারাশার দিকে নিসবত করে তাঁকে 'ইবনে খারাশা' নামেও বিভিন্ন সময় ডাকা হতো।

বদরের যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেন। মাথায় লাল কাপড় বেঁধে জীবন বিলিয়ে দেয়ার মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধের ময়দানে মাথায় বাঁধা লাল ফেট্টির কারণেই তাঁকে আলাদা করে চেনা যেতো। বদরের যুদ্ধে তিনি কুখ্যাত কয়েকজন কাফেরকে হত্যা করেন। উহুদের যুদ্ধে তাঁর উৎসর্গ ও বীরত্ব অভূতপূর্ব এক মাত্রার সংযোজন ঘটায় জিহাদের ইতিহাসে। রাসূল করীম (সা.) তাঁর নিজের তরবারিটি মুজাহিদদের কোনো একজনের হাতে তুলে দিতে চাইলে সেটির বহু প্রার্থী থাকলেও আবু দুজানার হাতেই তিনি তা তুলে দেন। আবু দুজানা (রা.) সে তরবারির হক আদায় করার প্রতিশ্রুতি দেন।

দুই

যুদ্ধের জন্য আবু দুজানার প্রস্তুতি মানেই হৃদয় থেকে শরীর, তরবারি থেকে চাল-চলন সব কিছুরই বিশেষ একটি ভঙ্গি। মাথায় লাল

কাপড়ের টুকরো বাঁধা আর বীরত্বব্যাঞ্জক ভঙ্গিতে রণাঙ্গণের দিকে দিকে বিচরণ ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর গোটা হৃদয়টা জুড়ে থাকতো জিহাদ ও শাহাদাতের তীব্র আগ্রহ।

উহুদের যুদ্ধে তাঁর আত্মনিবেদনের ঘটনাগুলো, রণাঙ্গণে তাঁর আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সাহসিকতার পর্বগুলোর যেন কোনো তুলনা ছিল না। উহুদ যুদ্ধের দিন বিপর্যয় ও বিশৃংখলার মুহূর্তে নবীজীর হাতে মৃত্যুর জন্য বাইআত হওয়া মুষ্টিমেয় সাহাবীদের মাঝে তিনিও ছিলেন। কাফের সেনারা যখন যুদ্ধের এক পর্যায়ে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে ঘিরে ফেলতে চাইলো তখন আবু দুজানাসহ ক'জন সাহাবী মানবঢাল হয়ে গেলেন। শত্রুদের অস্ত্র ও বর্ষার আঘাতের জন্য তাঁর নিজের পিঠ পেতে দিয়ে নবীজীর মুবারক দেহকে হেফাযত করেছেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেছে, আবু দুজানার পিঠ শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর ও বর্ষার আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে এ যুদ্ধে এগিয়ে আসা এক কাফেরকে এক কোপে ধরাশায়ী করে আবু দুজানা বলেন, 'ধর, আমি ইবনে খারাশা।' এ দৃশ্য দেখে নবীজী তাঁর প্রতি দু'আ জানিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি ইবনে খারাশার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট।'

উহুদের যুদ্ধে নবীজীর তরবারিপ্রার্থীদের মধ্য থেকে নবীজী কেন সেটি আবু দুজানাকেই দিলেন, তার রহস্য বুঝার জন্য রণাঙ্গনে তাঁর কর্মকাণ্ড লক্ষ করছিলেন সে তরবারিরই অপর প্রার্থী সম্মানিত সাহাবী হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.)। তিনি লক্ষ করে দেখলেন, আবু দুজানা এ তরবারি হাতে যে দিকেই এগিয়ে যেতে লাগলেন কাফেরদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়লো, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। এভাবে এগিয়ে যেতে যেতে কুরাইশ নারীরা পাহাড়ের ঢালে বসে যেখানে রণ-উত্তেজনা সৃষ্টিকারী গানবাদ্য গাইছিল সেখানেও তিনি চলে গেলেন। আবু দুজানার হাতে খোলা তরবারি ও তাঁর বিধ্বংসী

যোদ্ধারূপ দেখে হিন্দাসহ অপর নারীরা চিৎকার শুরু করলো সাহায্যের জন্য। কিন্তু কাফেরদের কেউ সেদিকে এগিয়ে এলো না। আবু দুজানা হিন্দার মাথায় তরবারিটি একবার রেখেও আবার উঠিয়ে নিলেন এবং ফিরে এলেন সেখান থেকে। তাঁকে অনুসরণকারী যুবায়ের এ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিলেন, 'রাসূলুল্লাহর তরবারি দিয়ে কোনো নিরস্ত্র নারীকে হত্যা করতে আমার মনে চায়নি।'

তিন

দ্বীনের জন্য আবু দুজানার এই জীবনবাজি লাগানো জীবনটির মূল্য ও কদর তো তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে পাচ্ছেন এবং পেয়েই যাবেন। হযরত রাসূলে করীম (সা.)-ও পরীক্ষিত এই সৈনিকের প্রতি সম্মাননা ও ভালোবাসার বেশ কিছু প্রকাশ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাবুক যুদ্ধে খাযরাজ গোত্রের ঝাণ্ডাটি তিনি আবু দুজানার হাতেই তুলে দিয়েছিলেন। এক যুদ্ধের সমস্ত গণীমতের সম্পদ আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় নবীজীর হাতে এলে সে সম্পদ থেকে প্রথম পর্বের মুহাজির সাহাবীদের পাশাপাশি আবু দুজানাকেও তাঁর দারিদ্র্যের কারণে কিছু সম্পদ দান করেন। নবীজীর যুগের সব যুদ্ধে আবু দুজানার সাহসী ও বীরত্বপুর্ণ ভূমিকা সব মুসলিমের প্রশংসা অর্জন করে।

আবু দুজানা (রা.) তাঁর ত্যাগী ও উৎসর্গিত জীবনের কারণেই সম্মানিত ও উঁচু মর্যাদার অধিকারী এক সাহাবী হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। প্রচণ্ড ঈমানী উত্তাপ আর প্রগাঢ় নবীপ্রেম ছিল তাঁর জীবনের মূল প্রাণশক্তি। জীবনের পদে পদে, পথে পথে এ প্রাণশক্তির তুমুল প্রকাশ তিনি ঘটিয়েছেন।

প্রশ্ন হলো, নবীজীর ইন্তেকালের পর এই সাহসী সাহাবী কি তাঁর জীবনের আগের বৈশিষ্ট্যগুলো ছেড়ে দিয়েছিলেন? আসুন, দেখি– তাঁর শেষ যুদ্ধের চিত্রটি।

চার

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে বড় ও প্রাণঘাতী যুদ্ধটি হয় ভণ্ডনবী মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে; ইয়ামামায়। এ যুদ্ধে বহু সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন, বিশেষত হাফেজ সাহাবীগণ। একটি সুরক্ষিত দুর্গে বসে যুদ্ধ পরিচালনা করার আনুকূল্য পেয়ে মুসায়লামা বাহিনীর পক্ষে ধ্বংসকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া সহজ হয়ে যাচ্ছিল। বেড়ে যাচ্ছিল মুসলমানদের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণনাশ। মুসায়লামার সুরক্ষিত দুর্গের প্রাচীর ভাঙ্গা বা ভেদ করা ছিল অসম্ভব বিষয়। কিন্তু এভাবে তো যুদ্ধ চালানো যাবে না। এর একটা কিছু বিহিত করতেই হবে। আবু দুজানা ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। যুদ্ধরত মুসলিমদের তিনি হাঁক দিয়ে বললেন, 'আমাকে তোমরা প্রাচীরের ভেতরে ছুঁড়ে মারো। আমি ভেতরে গিয়ে ফটক খুলে দেয়ার চেষ্টা করবো।'

উহুদের যুদ্ধে নবীজীর জীবনের ফেজাযতের জন্য তিনি তাঁর অস্তিত্বকে ঢালে পরিণত করেছিলেন। আর এ যুদ্ধে নবীজীর ইজ্জত ও শান রক্ষার লড়াইয়ে তিনি তাঁর অস্তিত্বকেই অস্ত্রে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রাচীরের ওই পাশে তাঁকে ছুঁড়ে মারলে তিনি যে এমনিতেও পড়ে গিয়ে মারা পড়তে পারেন, এটিও যেমন চিন্তার বিষয় ছিল, ঠিক একইভাবে ওপাশে গিজ গিজ করা সশস্ত্র শত্রুদের মধ্যে অক্ষত অবস্থায় একা গিয়ে ছিটকে পড়লেও তো মুহূর্তের মধ্যে তাদের অস্ত্রের আঘাতে নিহত হতে পারেন, এটাও যুক্তির বিষয় ছিল। কিন্তু এ ধরনের কোনো চিন্তা ও যুক্তি তাঁর মাথায় তখন জায়গা পায়নি। ইসলামের বিজয়ের সম্ভাব্য উপায়টিই তাঁর হৃদয়কে উৎসর্গের সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

তাঁর ঘোষণা শুনে কয়েকজন মুসলিম সৈনিক তাঁদের সর্বশক্তি এক সঙ্গে করে আবু দুজানাকে প্রাচীরের ওই পাশে ছুঁড়ে দিলেন। ওপাশে পড়ে গিয়ে প্রথমেই তাঁর পা ভেঙ্গে গেলো। কিন্তু ভাঙ্গা পা নিয়েই লড়াই চালিয়ে মূল ফটক পর্যন্ত এসে ফটক থেকে শত্রু সেনাদের সরিয়ে

মুসলিম যোদ্ধাদের দুর্গে ঢুকে পড়ার পথ খুলে দিলেন। যুদ্ধের চিত্রই এবার পাল্টে গেলো। অরক্ষিত দুর্গে মুসায়লামার অনুগত বাহিনীরা মুসলিম সৈনিকদের তরবারির আঘাতের সামনে ধরাশায়ী হতে থাকলো। এক পর্যায়ে ভণ্ড মুসায়লামাকে হত্যা করার ক্ষেত্রে হযরত ওয়াহ্শী (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) -এর সঙ্গে তিনিও শরীক হলেন। মুসায়লামা মারা পড়ার পর ভণ্ড মুসায়লামার অনুসারীদেরও মনোবল ভেঙ্গে গেলো। এ লড়াইয়ে দ্রুত মুসলিমদের বিজয়সূর্য উদিত হলো। লড়াইয়েরই এক পর্যায়ে ভেঙ্গে যাওয়া পা নিয়ে লড়তে লড়তে এক কাফেরের আঘাতে শহীদ হয়ে গেলেন জানবায লড়াকু যোদ্ধা হযরত আবু দুজানা (রা.); আবু দুজানা ইবনে খারাশা (রা.)।

শাহাদাতের লাল বিছানাকেই তাঁর জীবনের শেষ শয্যা হিসেবে বেছে নিলেন আবু দুজানা। না, আল্লাহর পথে উৎসর্গ ও বিসর্জনের পথ থেকে তিনি কখনো, সামান্য সময়ের জন্যও সরে যাননি। নবীয়ে আকরামের জীবদ্দশাতেও নয়, পরেও নয়। ⊙

[তথ্যসূত্র : সহীহ মুসলিম- ২৪৭০; ইবনে হিশাম- ৩/৬৬-৬৮]



ঘোড়সওয়ারের নামার সময় হয়নি!

মদীনার কুবা মহল্লায় তাঁর জন্ম হয়। তাঁর জন্মের ঘটনা মুহাজির সাহাবীদের মাঝে আনন্দ ও সুখের এক অপার্থিব ভালো লাগা ছড়িয়ে দেয়। তাঁকে তাঁর মহিয়সী মা আসমা (রা.) হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে পাঠিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় মুহাজির সাহাবীদের প্রথম এই নবজাত শিশুর মুখে একটু খেজুর চিবিয়ে রেখে দেন। রাসূলের পবিত্র থুথু দিয়েই শিশুটির খাদ্য-খানার সূচনা হলো। নবীজী তাঁর কল্যাণ কামনা করে দু'আ করলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) তাঁর কানে নবীজীর নির্দেশে আযান দিলেন। সাহাবীরা দিলেন আনন্দে তাকবীরধ্বনি।

জন্মমুহূর্ত থেকেই এতো সৌভাগ্য নিয়ে দুনিয়ায় আসা এই শিশুটির পরিচয় কী?

এই শিশুটির নাম আবদুল্লাহ। এ নামটিও রেখে দিয়েছেন আল্লাহর রাসূল (সা.)। এই শিশুর পিতা হচ্ছেন প্রখ্যাত মর্যাদাবান সাহাবী হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.), রাসূলুল্লাহর অতি বিশ্বস্তজন। রাসূলের ভাষায় তিনি ছিলেন তাঁর 'হাওয়ারী'। বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীর মাঝে তিনি অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ফুফু সাফিয়্যা (রা.)-এর সন্তান। হযরত হামযা (রা.)-এর ভাগ্নে। এ কারণে তাঁর শিশুটিকে তাঁর নিসবতে ডাকা হতো– আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)। আর শিশুটির মা? তিনি তো আরেক মহিয়সী নারী–

আসমা (রা.)। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বড় সন্তান। হযরত আয়েশা (রা.)-এর বড় বোন। একদম শৈশব থেকেই আসমার জীবন তাঁর পিতার সূত্রে ইসলামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। কিশোরী আসমা নবীজী ও পিতার জন্য হিজরতের সময় আত্মগোপন করা সেই 'গারে সাওরে' গোপনে খাবার নিয়ে যেতেন। পরবর্তী সময় তাঁর সঙ্গেই বিয়ে হয় যুবায়ের ইবনুল আওয়ামের। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী যখন মদীনায় হিজরত করছিলেন তখন আসমা ছিলেন পূর্ণ গর্ভবতী। হিজরতের পরপরই হয় আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের জন্ম।

দুই

ইসলামের জন্য নিবেদিত একটি বিশিষ্ট পরিবারে এই শিশু বড় হতে থাকেন। বাহাদুর পিতার সাহসিকতা আর জিহাদের উত্তাপ ও উদ্দামের মধ্য দিয়ে তিনি বেড়ে উঠেন। মায়ের পরহেযগারী ও পবিত্রতা দেখে দেখে তাঁর চোখ খুলতে থাকে। সংগ্রামী, সংযমী ও বিশ্বাসী একটি পরিবারে বেড়ে উঠায় খোদাভীরুতা, বিশ্বাস, ত্যাগ ও সংগ্রামের চেতনা নিয়েই তিনি বড় হন। মাত্র আট বছর বয়সে এই শিশু হযরত রাসূলে করীমের কাছে বায়আত হন। পিতা যুবায়েরের সঙ্গে কৈশোরের শুরুতেই ইয়ারমুকের যুদ্ধে শরীক হন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তরঙ্গ আদর, নানা আবু বকরসহ প্রধান সাহাবীদের স্নেহ-সুনজর আর সাহচর্যে তাঁর জীবনে উজ্জ্বল এক তারুণ্যের অভ্যুদয় ঘটে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) যেমন ছিলেন ইবাদতে অন্তপ্রাণ, আল্লাহর উপর নির্ভরশীল, উঁচু পরহেযগার একজন মানুষ, তেমনি দ্বীনের জন্য সংগ্রাম, জিহাদ ও লড়াইয়ে জানের বাজি লাগিয়ে দেয়া মহান বীরপুরুষ। সত্যের পথে অবিচলতা ও নিরাপস স্পষ্টবাদিতা তাঁর জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বৈশিষ্ট্যটি তাঁর ইহজীবনের হৃদয়ছোঁয়া অন্তিম দৃশ্যে আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

তিন

হযরত মুআবিয়া (রা.)-কে নবী দৌহিত্র হযরত হাসান (রা.)-এর পক্ষ থেকে খলীফা হিসেবে মেনে নেয়ার পর আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরও তা মেনে নেন। খলীফা হিসেবে হযরত মুআবিয়া (রা.)-কে মেনে নেয়ায় তাঁর কোনো আপত্তি থাকে না। কিন্তু ইয়াযিদকে খলীফা বানিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে মদীনায় উপস্থিত বিশিষ্ট সাহাবীগণের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি স্পষ্ট অসম্মতি জানান। এভাবেই বনু উমাইয়্যা রাজবংশের চক্ষুশূলে তিনি পরিণত হন। এরপর যখন শোকাকুল কারবালার ঘটনাটি ঘটে যায় তখন আবার আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ময়দানে নেমে আসেন। তিনি ইয়াযিদের শাসনের বিরুদ্ধে হেজায, মদীনা ও তিহামা অঞ্চলের মুসলমানদের বায়আত নিজেই গ্রহণ করেন এবং পৃথক রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন। আহলে বাইতের হত্যাকারী ইয়াযিদকে শাসক হিসেবে মেনে নেয়া তিনি আর বৈধ মনে করেননি। ইয়াযিদের কর্মচারীদের এসব অঞ্চল থেকে বের করে দেন। এদিকে শাসন কর্তৃত্বের ওপর আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে ইয়াযিদও সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেয়। তার সৈন্যরা মদীনা ও মক্কায় হামলা চালায়। এ হামলা চলার সময়েই ইয়াযিদের মৃত্যু হয় এবং তার ছেলে মুআবিয়া রাজত্বের দাবি ছেড়ে দেয়। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) স্বাভাবিকভাবে খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে গণ্য ও প্রতিষ্ঠিত হন। আবারো নৈতিক ভিত্তিতে যথার্থ পন্থায় ইসলামী শাসনের কার্যক্রম চালু হয়।

কিন্তু এভাবে চলেনি বেশি দিন। নীতিগত প্রশ্নে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের অবিচলতা আর নিরাপস অবস্থানের কারণে তাঁর শত্রুপক্ষের বিচরণ ও আস্ফালন সহজ হয়ে যায়। পর্যায়ক্রমে কতগুলো ঘটনা ও যুদ্ধে ইরাক, কুফাসহ বিরাট একটি অংশের ওপর কব্জা কায়েম করে নেয় আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান। শাসন কর্তৃত্ব

নিরংকুশ করার উদ্দেশ্যে মক্কা-মদীনার ওপর থেকে ইবনে যুবায়েরের শাসন ও আনুগত্য ছিনিয়ে নিতে সে এক বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। এ বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হয় মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ব্যক্তি– হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে। বাহাত্তর হিজরীর যিলহজ্ব মাসে এ অভিযান শুরু হয়।

চার

অভিযানটি সমাপ্ত হতে প্রায় ছয় মাস সময় অতিবাহিত হয়। হাজ্জাজ বাহিনী যখন মক্কা আক্রমণ করে এবং একের পর এক ধ্বংসলীলা চালাতে থাকে তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের কাবা-চত্বরে এসে উঠেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর অনুগত সৈনিকেরাও ছিলেন। প্রয়োজনীয় রসদপত্রও ছিল। তাঁদের অবরুদ্ধ করে রাখে হাজ্জাজ বাহিনী। তাঁদের অবরুদ্ধ রেখেই মাসের পর মাস কাবাঘরের দিকে গোলা বর্ষণ চলতে থাকে। মক্কার অলিতে গলিতে লুটতরাজ চালাতে থাকে হাজ্জাজের সিরীয় সেনারা। এতে মক্কা জুড়ে যেমন মানুষের জীবনে দুর্বিষহ সংকট নেমে আসে, তেমনি হযরত ইবনে যুবায়েরেরও রসদ ফুরিয়ে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে তাঁর আনুগত্য ছেড়ে চলে যেতে থাকে তাঁর সৈন্যরা। কিন্তু এ সংকটের শেষ কী, তা অনুমান করা সত্ত্বেও প্রশান্ত মনে প্রতি ওয়াক্তের নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন তিনি। আর আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে থাকতেন।

এই নারকীয় অভিযানের শেষ মুহূর্তে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের দেখেন– তাঁর সঙ্গে আছেন অতি মুষ্টিমেয় কিছু মুজাহিদ আর অপর পক্ষে বিশাল রণশক্তি। এ যুদ্ধের পরিণতি কোন্ দিকে যাচ্ছে– তিনি পুরোপুরি উপলব্ধি করে ফেলেন তখন। যুদ্ধও যে শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁরও যে অন্তিম সময় উপস্থিত হয়ে যাচ্ছে, এ সত্যটি বুঝতে পেরে তিনি তাঁর মা আসমা (রা.) -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। শেষ

পরামর্শ, শেষ উপদেশ গ্রহণ আর শেষ সাক্ষাৎ ও দু'আ লাভই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আসমা (রা.) তখন এক অশীতিপর বৃদ্ধা। বয়সের ভারে ন্যুব্জ এবং অন্ধ হয়ে গেছেন। প্রায় শত বছর তখন তাঁর বয়স।

পাঁচ

প্রৌঢ় আবদুল্লাহ– সত্য-অসত্যের প্রশ্নে যাঁর মাথায় এখন জীবনের শেষ হিসাব ও শেষ বোঝাপড়া– নিজের মাকে গিয়ে সালাম দিলেন। মা তাঁর সালামের জবাব দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাজ্জাজ বাহিনীর গোলার আঘাতে যখন তোমার বাহিনী বিপর্যস্ত, মক্কার বাড়িঘর প্রকম্পিত এমন মুহূর্তে তুমি আমার কাছে কেন এসেছো?' আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) বললেন, 'আম্মা! আপনার পরামর্শ নিতে।' আসমা (রা.) জানতে চাইলেন, 'কোন্ বিষয়ে পরামর্শ?' ছেলে জবাব দিলেন, 'আমার সঙ্গী-সাথীরা প্রায় সবাই হাজ্জাজের ভয়ে আমাকে ফেলে চলে গেছে। আমার সন্তান ও পরিবারের লোকেরাও আমাকে ছেড়ে গেছে। অল্প কিছু লোক আমার সঙ্গে আছে। তাদের সাহস ও ধৈর্য অধিক থেকে অধিকতর হলেও তারা দু-এক ঘণ্টার বেশি টিকে থাকতে পারবে না। অপর দিকে প্রস্তাব এসেছে, আমি যদি আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানকে খলীফা বলে মেনে নিই তাহলে আর যুদ্ধ হবে না, আমি দুনিয়ার যা সুখ চাইবো তারা তাই দেবে। এ অবস্থায় আমি কী করতে পারি?'

আসমা (রা.) দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, বিষয়টি তো একান্তই তোমার। তুমি তো তোমার নিজের ব্যাপারে বেশি জানো। তোমার যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তুমি সত্যের ওপর আছো, তাহলে যারা তোমার অধীনে থেকে শাহাদাত বরণ করেছে তুমিও তাদের মতো অটল থাকো। আর যদি দুনিয়ার সুখের জন্য এসব করে থাক তাহলে তুমি এক নিকৃষ্টতম মানুষ। নিজেকে এবং তোমার লোকদের তুমি ধ্বংস করেছো। এবার পুরুষের মতো যুদ্ধ করো। জীবনের ভয়ে কোনো অপমানকে সহ্য

করো না। অবমাননার জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো। তুমি শহীদ হলে আমি খুশি হবো। দুনিয়ার প্রতি তোমার লোভ থাকলে তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ কে আছে? যদি ভেবে থাকো একা হয়ে গেছো, আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, তাহলে জেনে রাখো– এ কোনো সম্মানী মানুষের পথ নয়।'

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বললেন, 'তাহলে আজ আমি নিহত হবো।' তাঁর মা এ কথা শুনে বললেন, 'আত্মসমর্পণ করবে আর শত্রুরা তোমার মস্তক নিয়ে খেলা করবে। এ থেকে যুদ্ধ করে নিহত হওয়াই তো ভালো।' ছেলে কাতর কণ্ঠে বললেন, 'আম্মা! নিহত হতে আমি ভয় পাচ্ছি না। ওরা তো আমার লাশকে বিকৃত করে ফেলবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলে রাখবে।' মা এবার বললেন, 'বাছা! নিহত হয়ে যাওয়ার পর আর ভয়ের কিছু নেই। যবাই করা ছাগলের চামড়া ছিলার সময় সে কি কষ্ট পায়?'

মায়ের মুখে দৃপ্ত এ উপদেশ শুনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের অন্তরে প্রশান্তি ছেয়ে গেলো। চোখে মুখে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, 'আমার কল্যাণময়ী আম্মা! আমার এ গভীর সংকটে আপনার মুখের এ স্পষ্ট কথাগুলো শোনার জন্য আমি এসেছিলাম। আল্লাহ জানেন, আমি ভীত নই। তিনিই সাক্ষী, আমি যে লড়াই করছি, তা দুনিয়ার কোনো সুখ লাভের জন্য নয়। হারামকে হালাল বলতে না পারার জন্যই এ লড়াই হচ্ছে। আমি শহীদ হলে আমার জন্য দুঃখ করবেন না।' মা আসমা (রা.) বললেন, 'যদি তুমি অসত্যের ওপর নিহত হও তাহলে আমি ব্যথিত হবো, দুঃখ পাবো।' ছেলে বললেন, 'আম্মা! আপনি বিশ্বাস রাখুন, আপনার সন্তান অসত্যের ওপর নেই। আপনার এ সন্তান কখনো অন্যায় ও অশ্লীল কিছু করেনি, আল্লাহর আইন লংঘন করেনি, কারো বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি, কারো ওপর জুলুম করেনি। আল্লাহর রেযামন্দীর চেয়ে আকর্ষণীয় তার কাছে কিছুই নেই।' এবার তিনি আকাশের দিকে মুখ উঠিয়ে বললেন, 'আল্লাহ!

আপনিই ভালো জানেন, আমি আমার আম্মাকে যা কিছু বলেছি তা কেবল তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যই বলেছি, যাতে তিনি আমার দুনিয়ার পরিণতি দেখে কষ্ট না পান।' মা বললেন, 'তোমার ব্যাপারে আমার ধৈর্য হবে অতুলনীয়। তুমি আমার সামনে শহীদ হলে সেটি আমার নাজাতের উপলক্ষ্য হবে। তুমি বিজয়ী হলে আমার আনন্দের কারণ হবে। আল্লাহর নাম নিয়ে এগিয়ে যাও!'

সত্যের প্রশ্নে দৃঢ়চেতা মা আসমা (রা.) বীরত্বের সঙ্গে তাঁর ছেলেকে শাহাদাতের পথে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অন্ধ মায়ের মনে পুত্রের প্রতি লালিত মমতার সাগরে ঝড় বয়ে গেলো। তিনি এবার বললেন, 'বেটা! তুমি আমার একটু কাছে এসো। আমি শেষবারের মতো তোমার শরীরের একটু গন্ধ শুঁকি। তোমাকে একটু ছুঁয়ে দিই। এটাই হয়তো তোমার ও আমার শেষ সাক্ষাৎ।' চূড়ান্ত মৃত্যুযুদ্ধে গমণোদ্যত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের মায়ের এ কথায় উবু হয়ে মায়ের হাতে-পায়ে চুমু দিতে লাগলেন। আর মা আসমা ছেলের মাথা, মুখ, কাঁধ ও বুকে নিজের নাক ও মুখ ঠেকিয়ে শুঁকতে লাগলেন আর চুমু দিতে লাগলেন এবং ছেলের দেহে হাত বুলাতে লাগলেন। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরার সময় আবার তিনি দ্বিধান্বিত স্বরে ছেলেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি শরীরে কী পরেছো?' ছেলে বললেন, 'এতো আম্মা, যুদ্ধের বর্ম।'

মা বললেন, 'বাছা! যারা শাহাদাত চায় তারা এ পোশাক পরে না। এ পোশাক খুলে ফেল। তোমার সাহসিকতা ও মর্যাদার সঙ্গে এর তো কোনো সামঞ্জস্য নেই। এতে তো তোমার চলাফেরাও বিঘ্নিত হবে। এর চেয়ে ভালো হবে তোমার জন্য লম্বা পাজামা ও ঢিলা পোশাক। তোমাকে মাটিতে ফেলে দিলেও তখন তোমার সতর খুলবে না।'

মায়ের কথামতো আবদুল্লাহ লোহার বর্ম শরীর থেকে খুলে ফেললেন। তারপর মায়ের কাছে শাহাদাতের আগে ও পরে উভয় অবস্থার জন্য দু'আ চাইলেন। আসমা তাঁর ছেলের জীবনের সব পুণ্যকর্মের একেকটি

তুলে ধরে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। আল্লাহর কাছে তাঁর সন্তানের প্রতি দয়ার আবেদন জানালেন। আল্লাহর যে কোনো ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করে ধৈর্যের শক্তি দানেরও দু'আ করলেন।

ছয়

মায়ের দু'আ নিয়ে প্রশান্ত মনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) শেষ যুদ্ধযাত্রা করেন এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অল্প ক'জন যোদ্ধা নিয়ে তিনি আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগলেন। এ ছিল নিবেদিত প্রাণের ও নিশ্চিত শাহাদাতের যুদ্ধ। তাঁর খোলা তরবারির আঘাতে শত্রুবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে লাগলো। যে দিকেই তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন, শত্রুবাহিনী পিছু হটে যেতে বাধ্য হচ্ছিল। শত্রুবাহিনীর আঘাতে তাঁর উন্মুক্ত ও অরক্ষিত দেহ থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে ছিটকে পড়ছিলো। হাজ্জাজ তাঁর এই অপ্রতিরোধ্য তরবারি চালনায় দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। কয়েকবার সে নিজের সৈন্যদের মাঝে শৃঙ্খলা এনে পুনঃআক্রমণে নিয়োজিত করলো। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে দমানো যায়নি। তাঁর উজাড় করা যুদ্ধে শত্রুবাহিনী বার বার পিছু হটলো এবং অনেকেই হতাহত হতে লাগলো। এসময়েই মসজিদের মিনার থেকে আযানের ধ্বনি ভেসে আসলো। এ ধ্বনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের কানে যেতেই তিনি তরবারি খাপে ভরে প্রশান্ত চিত্তে মসজিদে নামায আদায় করতে চলে গেলেন। নামাযের পর তিনি এসে দেখলেন তাঁর বাহিনীর সব সৈন্যই নিহত। কেউ আর তার পক্ষে অস্ত্র ধরার নেই। তিনি এবারো বিচলিত হলেন না। তরবারি কোষমুক্ত করে রণাঙ্গনে আবারো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অগণিত শত্রুর সারি ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেলেন এবং বিদ্যুতের গতিতে তরবারি চালাতে লাগলেন। এসময় সামনের দিক থেকে আসা একটি তীর তাঁর মাথায় বিদ্ধ হলো। মুহূর্তের মধ্যে রক্তে তাঁর মুখমণ্ডল ও দাঁড়ি ভিজে গেলো। বীরত্বব্যাঞ্জক ও ঈমানী ভাবপ্রকাশক কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তখনো তিনি

পূর্ণোদ্যমে লড়ে যেতে লাগলেন। প্রাণশক্তি এক পর্যায়ে তাঁর ফুরিয়ে গেলো। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সেদিন সন্ধ্যার আগেই বীর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) মহান মাওলার সান্নিধ্যে চলে গেলেন। ইতিহাসের এ হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে তিহাত্তর হিজরীর ১৭ জুমাদাল উলার মঙ্গলবার। শাহাদাতের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের লাশ শূলিতে ঝুলিয়ে রেখে দিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

সাত

ক'দিন পর এ পথেই আসলেন মা আসমা (রা.), সঙ্গে তাঁর দাসী। তিনি তো দেখতে পেতেন না। শূলিতে চড়ানো প্রিয় পুত্রের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন নীরব হয়ে কিছুক্ষণ। পুত্রের লাশের সামনে মমতাময়ী মাকে দেখে অশ্রুভেজা চোখে জনতা ভিড় করতে শুরু করলো। এরপর হৃদয়ের ভেতর থেকে হাহাকার করে উঠলেও অত্যন্ত ধীর ও দৃঢ় কণ্ঠে তিনি স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'দ্বীনের পথে এ ঘোড়াসওয়ারের এখনো কি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার সময় হয়নি?'

জনগণের ঐক্য ও ক্ষোভকে যার ভীষণ ভয় সেই হাজ্জাজ সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে আসমা (রা.)-কে সরে যাওয়ার নির্দেশ পাঠালো। কিন্তু অবিচল ও নির্ভীক শতবর্ষী এই সাহাবিয়া হাজ্জাজের হুকুমের কোনোই পরোয়া করলেন না। এরপর হাজ্জাজ নিজে এসে শহীদ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) সম্পর্কে কটুবাক্য উচ্চারণ করে মা আসমাকে ক্ষুব্ধ ও শোকগ্রস্ত করার পাশবিক চেষ্টা করলো। আসমা (রা.) নির্ভীকচিত্তে হাজ্জাজকে মিথ্যুক ও জালিম বলে সম্বোধন করে তার করুণ পরিণতির কথা মনে করিয়ে দিলেন। এক পর্যায়ে হাজ্জাজ আসমা (রা.)কে খেতাব করে বললেন, 'বলুন তো আমি আবদুল্লাহর সাথে কেমন ব্যবহার করেছি?' আসমা অত্যন্ত প্রশান্ত স্বরে জবাব

দিলেন, 'তুমি তার দুনিয়া নষ্ট করেছো। আর সে নষ্ট করেছে তোমার আখেরাত।' (তাকে হত্যা করার কারণে তোমার আখেরাত নষ্ট হয়েছে।)

আট

বেশ কিছু দিন শূলিতে ঝুলন্ত থাকার পর হযরত আবদুল্লাহর লাশ যখন নামানো হলো এবং সে লাশ মা আসমার কাছে আনা হলো তখন মা বহু কষ্টে যমযমের পানি আনিয়ে আদরের ছেলেকে গোসল দিলেন, কাফন পরালেন এবং জানাযার নামায পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। এর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আসমা (রা.) ইন্তেকাল করেন। ⊙

[তথসূত্র :
আল ইস্তিআব, নং– ১৫৩৫; আল ইসাবা- নং ৪৬৮৪;
আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া – ৬/৯৩]



স্মিত হাসির রেখা

সুন্দর ও মধুর ছিলো তাঁর কুরআন তিলাওয়াত। যে কেউ শুনতো, মুগ্ধ হয়ে শুনতেই থাকতো। আল্লাহর কালামের দরদী পাঠক-তিলাওয়াতকারী ছিলেন তিনি। মসজিদে নববীর পাশে ছিলো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরা বা বাসা। সেই বাসায় একবার হযরত আয়েশাকে (রা.) নবীজী ডাকলেন। বাসার ভেতরে কাছেই কোথাও ছিলেন হযরত আয়েশা (রা.)। সেখান থেকে তিনি নবীজীর কাছে যাবেন। কিন্তু নবীজীর কাছে পৌঁছতে তাঁর কিছুটা দেরি হয়ে গেলো। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন- 'আসতে তোমার দেরি হলো কেন?'

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) জবাব দিলেন- 'সুন্দর কণ্ঠে একজন কুরআন তিলাওয়াত করছেন। তার তিলাওয়াত শুনছিলাম।' সেই তিলাওয়াতের মাধুর্য্যের প্রশংসাও করলেন তিনি। আয়েশা (রা.)-এর মুখে তিলাওয়াতের প্রশংসা শুনে রাসূলে আকরাম (সা.) গায়ে চাদরটি টেনে বাইরে বের হলেন। এসে দেখলেন, এ-তো অন্য কেউ নয়, এ হচ্ছে সালেম; আবু হুযায়ফার দ্বীনি ভাই। সালেম মাওলা আবি হুযায়ফা। তাঁর তিলাওয়াত শুনে রাসূলে কারীম (সা.) মুগ্ধ হলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন- 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, আমার উম্মতের মধ্যে যিনি তোমার মতো মানুষ সৃষ্টি করেছেন।'

এই হচ্ছেন সালেম। ইসলামের প্রথম যুগের একজন ঈমানের পথে অগ্রসর শক্তিমান সাহাবী। পারস্য বংশোদ্ভূত। দাস হয়ে আরবে

আসেন। তাঁর মনিব ছিলেন একজন নারী- সুবাইতা। এই সুবাইতা-ই হচ্ছেন আবু হুযায়ফার স্ত্রী। পরবর্তী সময়ে সুবাইতা তাঁর দাস সালেমকে আযাদ করে দেন। আর তাঁর স্বামী আবু হুযায়ফা তাঁকেই ভাই ও বন্ধু রূপে গ্রহণ করে নেন। এজন্যই লোকে তাঁকে ডাকতো- মাওলা আবি হুযায়ফা। কেউ কেউ বলেন, তিনি আবু হুযায়ফারই আযাদকৃত দাস ছিলেন। কাছাকাছি সময়ে এঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। ঈমানের পথে বহু ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

ইসলামের প্রথম যুগে দাসত্বের বন্ধনে থেকেও যারা ঈমানের স্বর্ণালি দিগন্তে প্রবেশ করেছিলেন সালেম ছিলেন তাঁদেরই একজন। বিলাল, আম্মার, ইয়াসিরের মতোই। দ্বীনের জন্য ত্যাগ, কুরবানি, আস্থা এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি ভালোবাসার একটি জীবনই তিনি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর দ্বীনি বন্ধু ছিলেন আবু হুযায়ফা। প্রথমে ওই পরিবারের তিনি দাস ছিলেন। পরে ওই পরিবারেরই আস্থাভাজন বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি আস্থা ছিলো নবীজীরও। পূর্ণ আস্থা ও স্বস্তি ছিলো শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণেরও। আরবে তাঁর পরিবারের কোনো শেকড় ছিলো না। কিন্তু ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ততার পবিত্র সূত্রে মুসলিমসমাজে তিনি ছিলেন মর্যাদার শিখরে।

দুই.

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন কুরআন শরীফ পড়তে শেখার জন্য চারজন ব্যক্তির নাম ঘোষণা করেন। সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন- 'তোমরা কুরআন শেখো চার ব্যক্তির কাছ থেকে। (তারা হলেন) আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ, সালেম মাওলা আবু হুযায়ফা, উবাই ইবন কা'ব ও মু'আয ইবন জাবাল।' বড় বড় সাহাবীদের উপস্থিতিতে নামাযের জামাতে ইমাম করা হতো হযরত সালেমকে। হিজরতের সময় কুবা মসজিদে নামায পড়াকালে হযরত উমরের উপস্থিতিতে তাকেই ইমামত করতে হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.)-ও তাঁর পেছনে নামায পড়তেন।

তাঁর ঈমানি দৃঢ়তা, নৈতিক সততা, স্পষ্টতা ও আমানতদারির প্রতি গুণমুগ্ধ ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবীগণ। উপলক্ষ এলেই হযরত উমর তাঁর প্রশংসা করতেন। এমনকি ইনতিকালের আগমুহূর্তে তিনি বলেছিলেন– 'আজ সালেম জীবিত থাকলে আমি তাঁকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে যেতাম। এ ব্যাপারে শুরার পরামর্শের দরকার হতো না।'

দ্বীনের জন্য তিনি ছিলেন অসম সাহসী এক বীর পুরুষ। উৎসর্গিত এক আমরণ লড়াকু। শক্তিমান মুজাহিদ। রাসূলের জীবদ্দশায় বদর, উহুদ, খন্দকসহ সব যুদ্ধেই তিনি নবীজীর সঙ্গে জিহাদের ময়দানে ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি একজন কাফেরকে নিজ হাতে হত্যা করেন। কোনো জিহাদ বা লড়াইয়ের ডাকে তাঁকে অনুপস্থিত পাওয়া যায়নি। নিয়ম-নির্দেশনা ও নীতির কঠোর অনুসারী রূপে তাঁকে পাওয়া যেতো সবসময়। এক্ষেত্রে নিজস্ব পরিধির মধ্যে কখনো কোনো ব্যতিক্রম দেখলে স্পষ্ট ভিন্নমত ও প্রতিবাদে তিনি উচ্চকিত হতেন। ব্যক্তিগত বিরোধিতার চোরা ফাঁদ নয়, প্রতিবাদের সব কিছুই তিনি করতেন আল্লাহর ওয়াস্তে এবং নির্বিকার পক্ষপাতহীন মনোভাব নিয়ে।

তিন.

সাহসী, কুরআনপ্রেমী, উৎসর্গিতপ্রাণ সাহাবী- এই সালেম মাওলা আবি হুযায়ফা (রা.)-কে দেখা গেলো ইয়ামামার যুদ্ধে অন্যরকম এক আত্মদানের প্রস্তুতি রচনা করতে। ভণ্ড নবী দাবিদার মুসায়লামাতুল কাযযাব ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে চলছিলো এই জিহাদ। খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে এই ভয়াবহ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুসলিমশিবিরে একটি বিপর্যয়ের ধাক্কা লাগে। এরপর আবার মুসলিম সৈনিকরা অনমনীয় ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ান। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) সেনাবিন্যাস করেন অভিবন পদ্ধতিতে। আর মুরতাদদের হঠাৎ আক্রমণে সাময়িকভাবে পিছিয়ে আসা মুসলিম সৈনিকদের ঘুরে দাঁড়াতে অপূর্ব ভঙ্গিতে অনুপ্রাণিত করেন সালেম। প্রথমে তিনি চিৎকার দিয়ে বলেন-

'আফসোস! আল্লাহর রাসূলের সময় তো আমাদের অবস্থা এমন ছিলো না।' এরপরই ময়দানে নিজের জন্য একটি গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে যান। যেন ইচ্ছে করলেও পিছিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে। হয় লড়াই করতে হবে, নয়তো গর্তে আটকাবস্থায় শত্রু-আক্রান্ত হয়ে শহীদ হতে হবে।

এভাবে লড়াই আবার তীব্র হয়ে ওঠলো। শত্রুবাহিনীর হাতে হামলা চালানোর আগে সালেম ও আবু হুযায়ফা- দুই দ্বীনি ভাই ও বন্ধু কোলাকুলি করেন এবং শহীদ হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অন্য হাজারো সাহাবীর সঙ্গে তাঁরাও তরবারি চালাতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলিম সৈনিকদের পক্ষে পতাকা বহনকারী সাহাবী শহীদ হয়ে যান। মাটিতে পড়ে যাওয়া সেই পতাকাটি তখন সালেম ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। লড়াই চলতে থাকে। তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। কেউ একজন সালেমের হাতে পতাকা সুরক্ষিত থাকার বিষয়ে শঙ্কা ব্যক্ত করে বলেন– 'আশঙ্কা করছি, তোমার দিক থেকে শত্রুবাহিনী হামলা করবে।' এ কথা শুনে অমিততেজী সালেম দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন- (এটাতো কিছুতেই হতে পারে না)। আমি তো তাহলে হয়ে যাবো কুরআনের নিকৃষ্ট বাহক।'

জীবন-প্রাণ তুচ্ছ করে সালেম লড়তে থাকেন। এক হাতে তরবারি, আরেক হাতে তাঁর পতাকা। এর মধ্যেই আকস্মিকভাবে ঘটে যায় বেদনাদায়ক ঘটনা।

চার.

মুসায়লামার অনুসারী এক মুরতাদের তরবারির কোপ এসে পড়ে সালেমের ডান হাতে। হাতটি কেটে পড়ে যায়। তিনি তখন বাঁ হাতে পতাকাটি উঁচিয়ে ধরেন। শত্রু বাঁ হাতে কোপ বসায়। বাঁ হাতটিও তাঁর কেটে পড়ে যায়। তখন সালেম গলার সঙ্গে পেঁচিয়ে ধরে রাখেন পতাকার লাঠি। আর পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতে থাকেন। মুরতাদ শত্রুরা তাকে ঘেরাও করে আঘাত করতে থাকলে

তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। কিন্তু তখনও তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয় না।

এর মধ্যেই শত্রুবাহিনীর প্রধান- মিথ্যানবী, ধর্মত্যাগী মুসায়লামা নিহত হয় মুসলিম সেনাদের আক্রমণে। ময়দানে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে। শত্রুবাহিনী পরাজয় আর পলায়নের পথ ধরে। মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়। বিজয়ী সাহাবীগণ যুদ্ধে আহত ও শহীদদের খোঁজ নিতে থাকেন। কয়েকজন এসে দেখেন, সালেম ময়দানে রক্ত আর ধুলার সঙ্গে মিশে আছেন। এখনও তাঁর শাস-প্রশ্বাস চালু আছে। চরম মুমূর্ষু অবস্থা চলছে। তাদের দেখে সালেম দ্বীনি ভাই ও বন্ধু আবু হুযায়ফার কথা জানতে চাইলেন। তারা জানালেন, তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি তাঁর হাতে পতাকা তুলে নেয়ার সময় যিনি তাঁর দিকে শত্রুবাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কা করেছিলেন- তাঁর কথাও জিজ্ঞেস করলেন। উপস্থিত সাহাবীগণ জানালেন- তিনিও শহীদ হয়ে গেছেন। সালেম মাওলা আবি হুযায়ফা (রা.) তখন বললেন, 'আমাকে তাঁদের মাঝখানেই শুইয়ে দাও।' সাহাবীগণ বললেন, 'তাঁরা আপনার দু'পাশেই শহীদ হয়ে (শুয়ে) আছেন।'

সালেম মাওলা আবি হুযায়ফার কথা ও দম হয়তো শেষ হয়ে এসেছিলো। কুরআন-প্রেমিক এই মহান সাহাবী তখন কথা বন্ধ করে দিলেন। তরবারির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহ। দু'হাত আগেই কেটে পড়ে গেছে। জিহাদের ময়দানে জীবন এখন তাঁর অন্যরকম এক উচ্চতায় পৌঁছার প্রস্তুতি নিতে চলেছে। দুনিয়ার জীবন ফুরিয়ে এসেছে। তখনই দেখা গেলো, তাঁর মুখে একটি পবিত্র স্মিত হাসির রেখা ফুটে ওঠলো। কেবল একটি স্মিত হাসি। আর কোনো কথা নয়। সালেম তাঁর প্রকৃত ও সর্বশক্তিমান মাওলার সান্নিধ্যেই চলে গেলেন। রক্তের মধ্যে, আঘাতের মধ্যে, দু'হাত কর্তিত অবস্থায়ও মুচকি হাসি দিয়ে সালেম এই দুনিয়া ত্যাগ করলেন। ⊙

[তথ্যসূত্র : উসদুল গাবা- ২/২৪৬; আল ইসাবা, হায়াতুস সাহাবা]

লেখকের অন্যান্য বই

- নবীজীবনের দ্যুতিময় কাহিনীগুচ্ছ
  সবুজ গম্বুজের ছায়া

- শিশু-কিশোরদের জন্য
  মাহাবাযে কেরামের গল্প

- হাদীস ও ইতিহাসের গল্পপাঠ
  সকালের মিষ্টি রোদ

- দুই মনীষীর জীবন
  এই গরিবের ধন

- কিশোর-কিশোরীদের জীবন গড়ার বই
  শুধু তোমাদের জন্য

- আল্লাহর পথের ঠিকানা
  [উর্দূ ভাষণের সংকলন– 'তা'মীরে ইনসানিয়াত'-এর অনুবাদ]

- পত্রিকায় লেখালেখি
  স্টাইল ও কলা-কৌশল

লেখক পরিচিতি

শরীফ মুহাম্মদ।
জন্ম : ১২ নভেম্বর ১৯৭১ ময়মনসিংহে।
আব্বা : গোলাম রব্বানী
আম্মা : ফেরদৌস বেগম

তিনি শব্দের পিঠে শব্দ জুড়ে ঐতিহ্যের মালা গাঁথেন। ভাবের চাষে মননের ফসল ফলান। কথায় যাদুকরি প্রভাব। বক্তব্যে আচ্ছন্ন করেন প্রতিবেশ। তাঁর কলমের স্পর্শে প্রাণ ফিরে পায় আমাদের সোনালি ইতিহাস। মানবমায়া তাঁর স্বভাবজাত। চিন্তার গভীরে ডুবে যেতে পারেন অনায়াসে। ধ্যানমগ্ন হলে পৃথিবী বদলে যায় তাঁর। নতুন বোধের জন্ম দিতে পারেন সহজেই। অনুজদের আপন করার এক অপার্থিব ক্ষমতা আছে তাঁর। রাশভারি চলনে যদিও মনে হয় তিনি দূরগম্য। কিন্তু আড্ডায় এক প্রাণখোলা স্বপ্নপুরুষ। নয়া নয়া ফিকিরে ছুটে যান দেশের নানা প্রান্তে। তুলে আনেন আমাদের স্বাধীনতার আঁতুর ঘরের নায়কদের। মোহনীয় বর্ণনায় কাগজের জমিনে এঁকে যান ইতিহাসের চিত্রকল্প।...

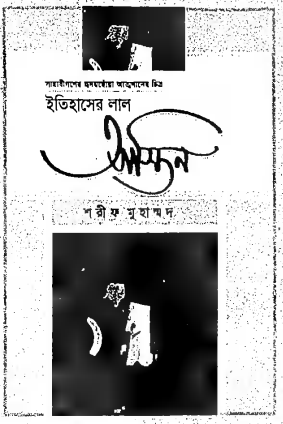
'সবুজ গম্বুজের ছায়া' দিয়ে তিনি আমাদের প্রেমিক বানিয়েছেন। 'কবিতার শেরওয়ানী' দিয়ে তিনি আমাদের ভাবের দুয়ারে আঘাত করেছেন। বৃটিশ বেনিয়া তাড়ানো ইতিহাসের যোদ্ধাদের খুঁজে এনে আমাদের গর্বিত করছেন।

সাহিত্যের অগ্রজ শ্রদ্ধেয় শরীফ মুহাম্মদকে আমার মতো অভাজনের কলম উপস্থাপনের যোগ্যতা রাখে না। তাঁকে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজন শব্দ, ভাব জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার এক বিশাল আকাশ। অথচ আমি তুচ্ছাতিতুচ্ছ। তবুও ভালোবাসতে যেহেতু হৃদয় ছাড়া আর কিছু লাগে না; তাই ভালোবাসার কথাই বলে গেলাম।

প্রিয়জন, শ্রদ্ধাস্পদ ও অগ্রজ এই সাহিত্য-সাধকের জন্য আমার হৃদয়ের বৈদ্য।

সাইফ সিরাজ
কবি, গল্পকার, শিক্ষক

কান্নাভেজা ইতিহাসের গল্প



'ইতিহাসের লাল আস্তিন' পড়তে বসেছিলাম। বারবার চোখের পাতা ভিজে ওঠছিলো। ইতিহাসের এই লাল অধ্যায়টি প্রায়ই আমাকে কাঁদায়। আজো কাঁদালো। প্রথমে পড়তে পড়তে কাঁদলাম। তারপর কাঁদতে কাঁদতে পড়লাম। আমার মনে হয়; ইতিহাসের এই অধ্যায়টির প্রতি সংবেদনশীল যে কোনো পাঠক 'ইতিহাসের লাল আস্তিন' পড়ে কাঁদবেন। তাঁর ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুকণা গিয়ে মিশে যাবে ইতিহাসের সেই বাঁকময় লাল নদীতে। কখনো উহুদে। কখনো ইয়ারমুকে। কখনো কারবালায়। ... বইটিতে ফুটে উঠেছে ইসলামের আত্মোৎসর্গী কাফেলার বরেণ্য রাজপুত্রদের অসামান্য বীরত্বগাঁথা। লালিমা ছড়িয়েছে ইসলামের বীর শহীদদের লাল ইতিহাসের লাল বর্ণমালা। প্রিয়নবী লাগিয়ে গিয়েছিলেন ইসলামের যে সবুজ চারাটি, তা-ই পত্র-পল্লবিত হয়েছে এই বীরপুরুষদের আত্মদানে ... রক্তদানে। আজ হাজার বছরের দূর ব্যবধানে বসেও আমাদের মনে ঝড় ওঠে, আহা, আমরাও যদি শরিক হতে পারতাম ইতিহাসের সেই লাল মিছিলে!

আমি বইটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করছি। শেষে বিশিষ্ট লেখক গবেষক সাহিত্যিক বন্ধু শরীফ মুহাম্মদকে এমন একটি নান্দনিক ও অনুভব-স্পর্শী সৃষ্টিকর্ম উপহার দেয়ার জন্যে হৃদয়ের গভীর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী
আলেম-গদ্যশিল্পী, সৃষ্টিশীল অনুবাদক

ISBN : 435-968-19890-9-1

MAKTABATUL AZHAR

মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
৯৮৮১৫৩২, ০১৯২৪০৭৬৩৬৫

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র
দোকান নং-১ আন্ডার গ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭১৫০২৩১১৮

maktabatulazhar@yahoo.com